প্রতিবিম্ব

শারদ স্মরণিকা-২০২২

মডার্ণ ক্লাব
ভট্টপুকুর, আগরতলা

প্রতিবিম্ব

২০২২

মডার্ণ ক্লাব,
ভট্টপুকুর, আগরতলা

"Pratibimba"
.... Saradiya Smaranika - 2022
Modern Club, Bhattapukur, Agartala, Tripura(West)

শারদ স্মরণিকা কমিটি

সম্পাদক : পার্থ সারথি দেব

সদস্য : পার্থ চক্রবর্তী
মিন্টু দেব
সুব্রত ভৌমিক
সুব্রত রায়
মালবিকা দেব

প্রচ্ছদ পরিচিতি : পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক থেকে আমেরিকা নিবাসী, ত্রিপুরার প্রবাসী **ডা: স্বপন চৌধুরীর** তোলা ছবি।

মুদ্রণ : অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রিন্ট, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা

সত্যমেব জয়তে
ত্রিপুরা সরকার

মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা

ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ণ ক্লাবের শারদ স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

উৎসব আমাদের সমাজ জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। শারদোৎসবের সার্বজনীনতা সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একাত্ম করে তুলে। গড়ে উঠে সৌভ্রাতৃত্ববোধ। শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার ঘটে, যা নতুন প্রজন্মকে সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত করে।

শারদোৎসব আয়োজনের পাশাপাশি ক্লাব এলাকায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক কাজে ক্লাবসমূহের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শারদ উৎসব আনন্দমুখর হোক এবং সকলের জন্য সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসুক।

প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা

সত্যমেব জয়তে
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা

উপ-মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা সরকার

শরৎ হল উৎসবের ঋতু। শিউলি ফুলের গন্ধ, কাশফুলের দোলা আর নীল আকাশে সাদা মেঘের ঘনঘটা আগাম জানান দেয় শারদোৎসবে তথা দুর্গাপুজার। নতুন এক অনুভূতির ছোঁয়ায় মেতে উঠে হৃদয় ও মন। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই প্রতীয়মান হয় বর্ণময় সাজো সাজো রব।

এককালের বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজা এখন আর কোনও একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দুর্গাপুজা বর্তমানে সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ ও সমাগমে দুর্গাপুজা হয়ে উঠেছে মানুষের মিলন উৎসব। দেবীবন্দনায় অনাবিল আনন্দে মেতে উঠেন মানুষ।

প্রকৃত অর্থেই শরৎ হল উৎসবের ঋতু। বিভিন্ন উৎসবেরই আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এক ঐকতানের সুর গ্রথিত হয়। ধ্বনিত হয় মহামিলনের সুর। হিংসা, দ্বেষ, কপটতা ভুলে গিয়ে সকল মানুষ একাকার হয়ে যায়।

এদিকে শারদোৎসবের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। এ বছরও সাড়ম্বরে ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ণ ক্লাব শারদোৎসবের আয়োজন করেছে। শারদোৎসব উপলক্ষ্যে মডার্ণ ক্লাব 'প্রতিবিম্ব' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করবে। আমি তাদের এই মহান উদ্যোগে সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

পাশাপাশি কামনা করছি শারদোৎসবের দিনগুলি মানুষের জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, সমৃদ্ধি, একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। মডার্ণ ক্লাবের সকল সদস্য / সদস্যাদের সঙ্গে রাজ্যবাসীর প্রতি রইল শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

যীষ্ণু দেব বর্মন

সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরা সরকার

মন্ত্রী
শিক্ষা, আইন
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ণ ক্লাব- এর সদস্যরা অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও শারদীয়া দুর্গোৎসব পালনে উদ্যোগী হয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শারদোৎসব আয়োজনে মডার্ণ ক্লাব এক অনন্য মাত্রা যোগ করবে। প্রতিবছরের মত এবারও মডার্ণ ক্লাব দুর্গোৎসব উপলক্ষে **'প্রতিবিম্ব'** নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করি, বিদগ্ধজনের রচনায় স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ হবে।

আমি এ-ও আশা করি, মডার্ণ ক্লাব একটি শৃঙ্খলাপরায়ন উৎসব আমাদের উপহার দেবে। দেবী দুর্গার কাছে সকলের সবার্থমঙ্গল কামনা করি।

(রতন লাল নাথ)

सत्यमेव जयते

ত্রিপুরা সরকার

Minister
Home (Fire and Emergency Service, Jail), Welfare of Other Backward Classes, Welfare of Minorities Department
Government of Tripura

Messege

*I am glad to know that modern club, Bhattapukur, Agartala, West Tripura is going to publish Puja Magazine **"Pratibimba"** on the occassion of Durga Puja-2022. I wish to congratulate all of you of Modern Club on this happy occassion.*

As a matter of fact, Puja Magazine mirrors the different faces of cultural developement of a Club as well as Societies of our State and thus it will be a very rewarding experience for all the sections of people. So far as I know, Modern Club, Agartala, West Tripura is continuosly working in this direction by arranging value based cultural activities and giving special emphasis on social welfare activities for upholding high moral value of society.

*I congratulate the President, the Secretary and all the members of Modern Club, Bhattapukur, Agartala to take initiative for Publishing of Puja Magazine **"Pratibimba"** on the ocassion of Durga Puja-2022. This is indeed a commendable achievement and also the result of dedication and hard work put in by you all which will lead the Club towards greater heights of glory.*

*I wish the publishing of Puja Magazine **"Pratibimba"** on the occassion of Durga Puja-2022 by Modern Club, Bhattapukur, Agartala, West Tripura a grand success*

Ram Prasad Paul

সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরা সরকার

মন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর,
পানীয় জল ও অন্যান্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষ্যে মডার্ণ ক্লাব শারদ সংখ্যা 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশ করতে চলেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মা মঙ্গলময়ীর আরাধনার আনন্দ সকলের হৃদয় খুশির প্লাবনে ভরে তুলুক, সকলের জীবনে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি, দেবী দশভুজার কাছে আমার এই প্রার্থণা।

সুশান্ত চৌধুরী

মেয়র
আগরতলা পুর নিগম

শুভেচ্ছা

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে 'মডার্ন ক্লাব' তাদের শারদ সংখ্যা **'প্রতিবিম্ব'** নামে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে এই সংস্থা শারদোৎসবে স্মরণিকা প্রকাশ করে থাকে। আশা করি এই স্মরণিকার মাধ্যমে এলাকার নতুন লেখক লেখিকারা তাদের শিল্পীসত্তা বিকাশের সুযোগ পাবে, পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনমূলক লেখা তরুন প্রজন্মের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

শারদোৎসবের এই মিলনমেলা সকলের কাছে প্রানবন্ত ও আনন্দময় হয়ে ওঠুক এই কামনা করছি। শারদোৎসব উপলক্ষে ক্লাবের সমস্ত সদস্য-সদস্যাসহ সমস্ত এলাকাবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দীপক মজুমদার

কর্পোরেটর
আগরতলা পুর নিগম
৪০ নং ওয়ার্ড

শুভেচ্ছা

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আসন্ন শারোদৎসবে মজার্ণ ক্লাব তাদের মুখপত্র **'প্রতিবিম্ব'** শারদ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর শারদ সংখ্যা প্রকাশের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশা করি এই স্মরণিকার মাধ্যমে এলাকার নতুন লেখক-লেখিকারা তাদের শিল্পীসত্তা বিকাশের সুযোগ পাবে, পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনমূলক লেখা তরুন প্রজন্মের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

দীর্ঘদিন ধরে মজার্ণ ক্লাব নানা ধরনের সমাজসেবামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আশা রাখি তাদের এই সামাজিক কাজ ধারাবাহিকভাবে জারি থাকবে।

শারদোৎসবের এই মিলনমেলা সকলের কাছে প্রাণবন্ত ও আনন্দময় হয়ে উঠুক এই কামনা করছি।

শারদোৎসব উপলক্ষে ক্লাবের সমস্ত সদস্য-সদস্যাসহ সমস্ত এলাকাবাসীকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাচ্ছি।

সম্পা সরকার চৌধুরী

আগরতলা পুর পরিষদ
AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL
আগরতলা মিউনিসিপাল ককচাপ
ESTD : 1871

চেয়ারম্যান
আগরতলা পুর নিগম
দক্ষিণ অঞ্চল, আগরতলা

শুভেচ্ছা

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে প্রতিবারের মত আমাদের প্রিয় শহর আগরতলার ঐতিহ্যবাহী ভট্টপুকুর, নাগেরজলাস্থিত 'মডার্ণ ক্লাব' এ বৎসরও তাদের মুখপত্র **'প্রতিবিম্ব'** শারদ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত ।

সুদীর্ঘ কাল ধরে মডার্ণ ক্লাব নানা ধরনের সমাজ সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে, আমার আশা এই স্মরনিকায় বিভিন্ন সচেতনতা মূলক লেখায় সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে, পাশাপাশি নতুন লেখকদের লেখায় আলোকিত হবে।

মায়ের কাছে আমার কামনা শারদোৎসবের দিনগুলি সকলের জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, সমৃদ্ধি, একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। মডার্ণ ক্লাবের সকল সদস্য/সদস্যাদের সঙ্গে রাজ্যবাসীর প্রতি রইল শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অভিজিৎ মৌলিক

সভাপতি
আগরতলা ক্লাব ফোরাম

শুভেচ্ছা

সারা বছর শারদোৎসবের এই চারটি দিনের জন্য অপেক্ষায় থাকি। মহামিলন মেলায় আনন্দে মেতে উঠি আমরা সবাই। এবার তো সাড়ম্বরে দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' হিসাবে নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে পালিত হয়েছে। এক দেশ, এক প্রাণ, এক পরিচয়, এক নিশানের আহ্বানের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ, আত্মনির্ভর, শক্তিশালী ভারতের কথাই বলা হয়েছে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব'-এ। শারদোৎসবও মহামিলনের উৎসব। এই উৎসবে শামিল হয়ে আনন্দের পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্রতী হই আমরা। প্রতিটি মানুষের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ উৎসব আজ শুধু পুজার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, নান্দনিক সাংস্কৃতিক চর্চাও এই সময়ে ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। বিশেষ করে বিভিন্ন ক্লাব থেকে প্রকাশিত শারদ সংখ্যাগুলো সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। কিছু কিছু শারদ সংখ্যা তো সাহিত্যপত্র হিসাবে উৎকৃষ্টতার দিক থেকেও প্রশংসার দাবি রাখে। মডার্ণ ক্লাবের শারদ সংখ্যা **'প্রতিবিম্ব'** এরমধ্যে অন্যতম। **'প্রতিবিম্ব'**র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। সেইসাথে মডার্ণ ক্লাবের সদস্য-সদস্যাসহ আপামর রাজ্যবাসীকে শারদোৎসবের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রণব সরকার

শুভেচ্ছা

সবার জন্য রইল শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তেজোময়ী ত্রিনয়নী দশভুজার আগমনে রাজ্যবাসী মেতে উঠেছেন আনন্দ উৎসবে। মডার্ণ ক্লাব আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে মায়ের আরাধনায় ও শারদ স্মরনিকা **'প্রতিবিম্ব'** প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছে।

আমাদের আগরতলার ক্লাবগুলিকে নিয়ে গঠিত 'আগরতলা ক্লাব ফোরাম'- এর দিশা ও প্রয়াস হচ্ছে— আমাদের প্রিয় আগরতলার যুব-ছাত্র সমাজকে ধ্বংসাত্মক-মারাত্মক নেশার কবল থেকে মুক্ত করা, এই বিষয়ে যুব সম্প্রদায়কে ও তাদের অভিভাবকদের সচেতন করা, নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বার্তা দেওয়া ও সহযোগিতা করা। মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা "মা" যেন আমাদের এই দিশাতে এগিয়ে যেতে শক্তি ও সাহস দেন।

মায়ের আগমনে চলুন আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রিয় আগরতলা শহরকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

ভালো থাকবেন, সুস্থ থাববেন, স্বচ্ছ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুন। পুজোর দিনগুলো আপনাদের আনন্দে ভরপুর থাকুক। সকলের জীবন মঙ্গলময় হোক— এই কামনা করছি মায়ের কাছে।

সজল চক্রবর্তী
যুগ্ম সম্পাদক
আগরতলা ক্লাব ফোরাম,
সভাপতি
মডার্ণ ক্লাব

ক্লাব সম্পাদকের বার্তা

আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘ মালা......
জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণধারিণী।
অভয়া শক্তি, বলপ্রদায়িণী, তুমি জাগো।
জাগো, তুমি জাগো।
প্রণমি বরদা, অজরা, অতুলা, বাহুবলধারিণী, রিপুদলবারিণী, জাগো মা
শরন্ময়ী, চন্ডিকা, শঙ্করী জাগো, জাগো মা।
জাগো অশুর বিনাশিনী, তুমি জাগো।
জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণধারিণী।
অভয়া শক্তি, বলপ্রদায়িণী, তুমি জাগো।
জাগো, তুমি জাগো।...
বাজলো তোমার আলোর বেনু,
শারোদীয়া দুর্গোৎসবে রাজ্যবাসীর প্রতি রইলো প্রীতি শুভেচ্ছা।

এখন মডার্ন ক্লাবের কর্মকান্ড নিয়ে কিছু কথা—

আমরা মডার্ন ক্লাব শারদীয়া দুর্গোৎসব ছাড়াও বছরের প্রতিটি দিন মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। কোভিড-১৯ পারিস্থিতিতে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত খোঁজ-খবর নেওয়া, বাড়ীতে ফল ও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া, বিনামূল্যে অক্সিজেন প্রদান করছি আমরা। কোভিড পারিস্থিতিতে কর্মহীন অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদানে আমরা মডার্ন ক্লাব অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছি। প্রতি বছর নেতাজী জন্ম জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান উৎসব, বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষাসহ ১৩ দিনব্যাপি বিভিন্ন বয়সী শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ আরো বিভিন্ন কর্মকান্ড করে থাকি।

সঞ্জিত নাহা
সম্পাদক
মডার্ণ ক্লাব

শারদীয়
শুভেচ্ছা
২০২২
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু
মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তসৈ নমস্তসৈ
নমস্তসৈ নমো নমঃ।।
রাজ্যবাসীকে জানাই
শারদীয় শুভেচ্ছা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব। এসে পড়া থেকে আসছে আসছে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মজাদার। শারদোৎসবের আগে এই রেশটা উপভোগ করেন ছেলে-বুড়ো সবাই। উৎসবের আনন্দ চলবে দীপাবলি পর্যন্ত। এই সময়ে অনাবিল আনন্দে মেতে থাকবো আমরা সবাই। উৎসবের আনন্দে গা ভাসাতে কে না চান ? বিশ্বকর্মা পুজোর ঢাকে কাঠি পড়া থেকেই মন মেতে উঠে উৎসবের আনন্দে। তার সাথে নীলাকাশে পেঁজা তুলো মেঘ, নদীর পাড়ে কাশ ফুলের দোলা, উঠোন বিছানো শিউলির গায়ে লেগে থাকা বিন্দু বিন্দু শিশির আমাদের মনে করিয়ে দেয়— আসছে শারদোৎসব। রাজ্যের নানা স্থানে গণেশ চতুর্থীও এখন সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। ফলে উৎসবের পিরিয়ডটা বেড়ে গেছে অনেকটাই। বাঙালির পার্বণ আজ আর বারো মাসে তেরো এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পাবর্তী ত্রিপুরায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও জাতি-উপজাতিসহ সব অংশের মানুষ বইমেলা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানের মতো সামাজিক বিষয়গুলো নিয়েও সারা বছর উৎসবে মেতে থাকেন। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক নেয়ার মানুষের মধ্যে যে স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহ তৈরি হয়েছে তা কোনো অংশে উৎসবের চাইতে কম নয়। উৎসব যেটাই হোক, নির্বিঘ্নে পালন করতে না পারলে সব আনন্দই মাটি। তাই সবার আগে চাই সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। রাজ্যবাসী শান্তি পছন্দ করেন। পছন্দ করেন নান্দনিক সাংস্কৃতিক চর্চা। এই রাজ্যের সাহিত্য কর্মকাণ্ডও দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন লেখক গোষ্ঠী। যাদের অনেকের সৃষ্টিই বহির্রাজ্যেও দারুণ সমাদৃত হচ্ছে। শারদোৎসবে প্রবীণ-নবীন লেখক, কবিদের নিয়ে সাহিত্যের ডালি সাজিয়ে হাজির **"প্রতিবিম্ব"**ও। আশা রাখছি এবারও মডার্ণ ক্লাবের এই শারদ সংখ্যা সাহিত্যপ্রেমীদের মনে জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। এ বছরও **"প্রতিবিম্ব"** প্রকাশ হতে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সেইসাথে শারদোৎসব মহা ধুমধামে ও নির্বিঘ্নে কাটুক — এই প্রার্থনা রইলো। অনাবিল আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠুক গ্রাম-পাহাড়সহ গোটা রাজ্য। সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনুক প্রতিটি মানুষের।

পার্থ সারথি দেব
সম্পাদক
প্রতিবিম্ব

সূচিপত্র

আমার পাড়া
- শেকড়ের টানে — **জবা চৌধুরী** (১৭)
- পুকুরের আর্তনাদ — **মনিকা দেব** (২৫)

গল্প
- তালিবানের মা — **অরুণোদয় সাহা** (২০)
- রূপকথার ছোট্ট স্বপ্ন — **অলক দাশগুপ্ত** (২৮)
- দুগ্গা.. দুগ্গা.. — **পি এস দেব** (৩০)
- ‘কিক্ কিকিউ, কিক্ কিকিউ’ — **অরিন্দম নাথ** (৪২)
- মাতৃত্ব — **মঞ্জুশ্রী বর্ধন** (৪৪)
- বসন্তের ফোটা ফুল — **নীলিমা দাশগুপ্ত** (৪৭)
- ফেইক মুখ — **শোভা দেববর্মা** (৫৪)
- ফিরে আসা — **নন্দিতা ভট্টাচার্য** (৫৯)
- বিশ্বাসের ঘরে চুরি — **প্রনব সেনগুপ্ত** (৬২)

প্রবন্ধ
- জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনা ও মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য — **অয়ন সাহা** (২১)

পড়শি
- পদ্মা সেতুর সুফল পাচ্ছে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গও — **রফিকুল ইসলাম সবুজ** (৩৭)

সাবধান
- পানীয় নয়, এটা বিষ—**শ্রাবন্তী রায়চৌধুরী** (৩৯)
- লোভে পা না — **সঞ্জয় দত্ত** (৪৫)

চিকিৎসা
- নীরব আততায়ী ডায়াবেটিস — **ডা: সুশান্ত কুমার সেন** (৫১)
- ওষুধে নয়...ব্যয় করুন সুস্বাস্থ্যে — **ডা: অভিক চক্রবর্তী** (৫৭)

মোদের ক্লাব
- ছবিতে — (৩৫)
- মডার্ণ ক্লাব ও পূজা কমিটি (৬৬)

কবিতা
- পরিবর্ত — **মানস পাল** (২৬)
- বিবেক কেমন আছো — **পীযূষ রাউত** (২৬)
- চিরন্তন স্বাধীনতা— **রাতুল দেববর্মণ** (২৬)
- তালের বড়া—**দিলীপ দাস** (২৬)
- আমরা কেউ একা নই — **অপাংশু দেবনাথ** (২৭)
- বৃষ্টি ভেজা মন — **শেখর সি. দত্ত** (২৭)
- কোশবিভাজন ও প্রেমিক — **দিপ্সি দে** (৪০)
- ভার্চুয়ালের ডাক — **মৌসুমী কর** (৪০)
- কিছু কথা — **সংহিতা ভট্টাচার্য** (৪১)
- দিনের পর রাত — **নিয়তি দাস** (৪১)
- কাশফুল — **মনচলি চক্রবর্তী** (৪১)
- পুজো এলে — **বাঁধন চক্রবর্তী** (৪৮)
- আগমনী — **মণীশ রুদ্রপাল** (৪৮)
- ফ্ল্যাট — **নিয়তি রায় বর্মণ** (৪৯)
- আমি মনে মনে বলি— **নারায়ণ ভট্টাচার্য** (৪৯)
- আকাশের হৃদয়ে — **পূর্বিতা গুপ্ত** (৪৯)
- দশভুজা — **সুপর্ণা মজুমদার রায়** (৫০)
- ইচ্ছে হয় ঘুরে আসি — **টিংকু রঞ্জন দাস** (৫০)

নারী ভাবনা
- উন্নত হোক চেতনা বিকশিত হোক ভাবনা — **বর্ণালী গোস্বামী** (৩৪)

খেলা
- নেতৃত্ব নিয়ে সংকটে ভারতীয় ক্রিকেট — **সরযূ চক্রবর্তী** (৬৪)
- ত্রিপুরার প্রজ্ঞাত যোগাসনের প্রেরণা — **বিপ্লব চন্দ** (৬৫)

- **আঁকাবুকি** — অর্পিতা , অলয়, হৃত্তিক, সৃনিকা, অগ্রতা, দেবারতি (৬৩)

আমার পাড়া

শেকড়ের টানে

জবা চৌধুরী

সময়ের সাথে পায়ে পায়ে চলে জীবন একদিন ঠিক আমাদেরকে পৌঁছে দেয় এমন একটা অধ্যায়ে যেখান থেকে ফিরে তাকালে ছেলেবেলার দিনগুলোকে অমূল্য বলে মনে হয়। লেখাটা যখন পড়ছেন তখন আমি ঠিক আপনার থেকে সাড়ে ৯ ঘণ্টা পিছিয়ে। এই সময়ে পশ্চিম গোলার্ধে বসে শারদ আমেজ আমার মনেও একটু একটু দোলা দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের রাজধানী আটলান্টায় এখন ফল ঋতু (Fall Season)। আমাদের শরৎকালের সাথে এর মিল আছে অনেকটা। এতো দূরে বসে ঢাকের শব্দ কানে না এলেও, মন পড়ে থাকে আগরতলার শারদোৎসবে। মনে পড়ে আমার পাড়ার পুজোর বহু স্মৃতি। আগরতলার সাথে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আমি হয়তো ৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পিছিয়ে। কিন্তু পুজো এলেই আমি সময়ের হাত ধরে স্মৃতিতে পৌঁছে যাই আরও অনেক অনেক পেছনে। আমার ছেলেবেলায়।

তখন আমার বয়স তিন। আগরতলার রামনগর ছেড়ে বাবা-মা আর পরিবারের হাত ধরে আমি এসে পৌঁছলাম নতুন পাড়ায়। ভট্টপুকুর ! বাড়ি কিনে এই পাড়ায় আমাদের আসার কারণটা ছিল আমার বাবার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আন্তরিক আমন্ত্রণ। এ পাড়ায় আগে থেকেই ছিলেন বাবার কয়েকজন বন্ধু। এ ছিলো আমাদের পুরো পরিবারের জন্য এক বিশেষ আনন্দের। তখনকার সময়ে পাড়া আর পরিবার— দু'টো শব্দের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। এ বাড়ি, ও বাড়ি যাওয়া-আসা কোনো ভদ্রতার মাপকাঠিতে চলতো না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের খোঁজ-খবর রাখতো একেবারেই নিজের মতো করে। নতুন পাড়া তাই দেখতে না দেখতেই ভালোবাসার টানে আমাদের নিজের হয়ে গেলো একদিন খুব সহজে।

ভট্টপুকুর, আগরতলা শহরের একটা বড় অঞ্চলজুড়ে। আমরা ভট্টপুকুরের যে দিকটার বাসিন্দা হয়েছি, সে দিকটা 'সর্দারপুকুর পাড়' নামেই বেশি পরিচিত । এখনো মনে পড়ে সেই সর্দারপুকুরটি। আমার ছেলেবেলার চোখে সেটা ছিল একটা বিশাল সমুদ্র সমান। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু গেলেই সেই বিশাল পুকুর। ভয়ে বড়দের হাতটা বেশ শক্ত করে ধরে তবেই সেই রাস্তাটা পেরোতাম। কেন জানি

আমেরিকায় নিজ বাড়িতে বরের সাথে লেখিকা

মনে হতো— এ-ই বোধহয় পড়ে যাবো। সেই রাস্তাটাও কি আর এখনকার মতো ছিলো? অনেকটা সরু আর মাটির রাস্তা ছিলো সেটা। আর তার দু'পাশে অনেকটা জলা জায়গা জুড়ে ঢেকে থাকতো কচুরিপানায়।

বৃষ্টি-বাদলের দিনে তখনকার এ পাড়ার বাসিন্দাদের খুব সাবধানে পেরোতে হতো ওই পথটুকু। ইলেকট্রিসিটি তখন আশেপাশের অনেক পাড়াতেই ছিল না। আমাদের পাড়াতেও তাই। টর্চ জ্বালিয়ে খুব সাবধানে পেরোতে হতো ভেতরের রাস্তাটুকু। হ্যারিকেন হাতে নিয়ে এ বাড়ি, ও বাড়ি যাওয়া-আসাটা খুব স্বাভাবিক ছিলো তখন। এভাবে চলাফেরা এবং থাকাটা আমরা এখন হয়তো কেউ ভাবতেই পারি না। কিন্তু মানুষ তো অভ্যাসের দাস। তখনকার দিনগুলো ঠিক চলে যেতো সকলের স্বাভাবিকভাবেই।

আমাদের পাড়ায় প্রথম পুজো শুরু হয়েছিল সরস্বতী

পুজো দিয়ে, ১৯৬৫ সালে। আমরা তখন একেবারেই নতুন ভট্টপুকুরে। খুব অস্পষ্ট হলেও আমার ঠিক মনে আছে সেই পুজো। কেউ একজন সেই প্রথম পুজোর ছবিও তুলেছিল। সেই ছবি কোথাও একবার দেখেছিলাম আর সেটাই আমার স্মৃতিকে হয়তো জাগিয়ে রেখেছে আজ পর্যন্ত।

তারও এক বছর পর বড়রা ঠিক করলেন পাড়ায় দুর্গাপুজা হবে। আমার বাবা জগদীশ চক্রবর্তী, মাখন লাল কর, নগেন্দ্র রায়, কার্তিক চক্রবর্তী, দিগেন্দ্র দেবরায়, রাকেশ দেবরায়, ধরণী ভট্টাচার্য, কান্তি চক্রবর্তী, শেফাল দাসগুপ্ত এবং বাবাদের বয়সী আরও অনেক কাকু-জ্যেঠুরা মিটিং করে সব ঠিক করলেন। আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে সুধীর দত্ত মেসোমশাই, যিনি মালু দত্ত নামে বেশি পরিচিত ছিলেন, তাঁদের বাড়ির সামনের একটা বিশাল অংশ তখন ফাঁকা ছিলো। সকলের অনুরোধে পুজোটা ওখানেই হবে ঠিক হলো। ১৯৬৮ সালে সেই ছিল ভট্টপুকুরের প্রথম দুর্গাপুজো। সে বার "উত্তর বাধারঘাট ভট্টপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব" এই নামে পাড়ার প্রথম দুর্গাপুজো হয়। সেই সময় পুরোনো ক্লাব হিসাবে আশেপাশের মধ্যে ছিল উন্নয়ন সংঘ। আমাদের এই দুই ক্লাবের মধ্যে অনেকটা মেলবন্ধন ছিল। পুজোর সময় দুই ক্লাবের ঢাকিরা একে অপরের ক্লাবে গিয়ে ঢাক বাজিয়ে আসতো।

> *ছয় ঋতুর দেশ আমাদের ভারতের সাথে চার ঋতুর দেশ আমেরিকার সার্বিক মিল না থাকলেও, আমাদের শরৎকালের সাথে আমেরিকার ফল ঋতুর অনেকটা মিল। নিজের দেশকে ভালোবেসে বিদেশের মাটিতে আমরা দেশ গড়ার চেষ্টা করি। দুর্গাপুজো করি আমাদের বিদেশের ব্যস্ত জীবনে যতটা সাধ্য তা দিয়ে।....*

সেই সময় বড়োরাই বেশিরভাগ কাজ দেখার দায়িত্বে থাকতেন। পুজোর খরচ বাঁচাতে সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। প্রথমদিকের পুজোতে মাখন কর মেসোমশাই মফঃস্বল থেকে গাড়ি ভর্তি করে পুজোর সব বাজার নিয়ে আসতেন। কেউ নিজেদের বাঁশঝাড় থেকে প্যান্ডেল বানানোর বাঁশ দিতেন। বড়োরা পুজোর প্ল্যান করে দিলেও সমস্ত কাজের দায়িত্বে থাকতেন পাড়ার অনেক কাকুরা আর দাদারা। এতগুলো বছর পর অনেকের নাম মনে করতে না পারলেও, মনে পড়ছে সমরকাকু, ক্ষীরোদকাকু, তপনদা, মিহিরদা, সঞ্জুদা, মনুদা এবং বিপ্লবদার কথা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে চারদিনের পুজোটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতো। আমরা যারা তখন স্কুলেও যেতে শুরু করিনি— আমাদের ছিল কত জল্পনা আর কল্পনা। বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে দেখতাম প্যান্ডেল বানানো। দেখতাম এতো বড়ো কাঠামোতে একসাথে সপরিবারে দুর্গামায়ের আসার দৃশ্য। ওটাই আমার প্রথম পুজোর স্মৃতি।

সে সময়ে ভোর হতেই আমাদের বাড়িতে উঠোনজুড়ে পড়ে থাকতো শিউলি ফুল। সন্ধ্যে হতেই গাছের ডালগুলো আবার ভরে উঠতো নতুন ফুলে। যেন একটা ম্যাজিক ! আমাদের কলতলার দিকে ছিলো বিশাল বড়ো স্থলপদ্মের গাছ। বাবা একদিন বলেছিলেন দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে সেই ফুলগুলো সকালে পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে দিয়ে আসতে। ওটাকে আমার নিজের দায়িত্ব বলেই ধরে নিয়েছিলাম। ঘরের পুজোর জন্য গুনে গুনে কয়েকটা ফুল বাড়ির ঠাকুরঘরে রেখে সাঁঝি ভরে ফুল নিজে নিয়ে যেতাম পাড়ার পুজোর জন্য।

খুব ঘরোয়াভাবে পুজোর তিনদিন সন্ধ্যায় মায়ের আরতি হতো। সেবার প্রথমবারের মতো গান-বাজনা হলো অষ্টমী রাতে। মনে পড়ছে না কে বা কারা গান করেছিলেন। কিন্তু আমার বাবা তবলা বাজিয়েছিলেন তাদের সাথে — আমার কাছে সেটা ছিল এক বিস্ময় ! এর আগে আমি কখনো বাবাকে তবলা বাজাতে দেখিনি। পরে অবশ্য মা'র কাছে জেনেছিলাম বাবা বেশ ভালো তবলা বাজাতেন। আরও একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছিল, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রভাত চৌধুরী জ্যেঠু পুজোর নবমীতে ধামাইল নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন হয়তো এসব আর ভাবা যায় না।

এমনি করে প্রতি বছর পুজোর সমারোহ থেকে শিখেছিলাম বছরের ওই একটা সময়ে শরতের আকাশে-বাতাসে শিউলির গন্ধ, ধূপের গন্ধ আর ঢাকের বাদ্যি মিলেমিশে একাকার হয়। আর সেই অসীম খুশিতে হারিয়ে যেতে আমরা অপেক্ষা করি আবারও একটি বছর ধরে। আর এই জানাটা সম্ভব হয়েছিলো আমাদের পরিবারতুল্য পড়শিদের জন্য।

এমনি করেই আমাদের এই ভট্টপুকুর পাড়ায় মডার্ণ ক্লাব সগর্বে সাতান্নটি বছর পার করেছে। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে। যোগ হয়েছে অনেক নতুন মুখ। রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে অনেক। আমাদের সেই সর্দার পুকুরও আর নেই। অনেক বছর আগেই একসময় সেটাকে মাটিতে ভরাট করে এর উপর তৈরী হয়েছে অনেক বাড়িঘর। জীবনের উন্নতির সাথে যাপনের স্বাচ্ছন্দ্যের একটা বিশেষ যোগ রয়েছে। আমাদের মডার্ণ ক্লাব এরই এক উদাহরণ। বাৎসরিক বিভিন্ন পুজো ছাড়াও এই ক্লাব তার ছোট-বড় সকল সদস্যদের জন্য বছরব্যাপী নানা ধরনের খেলাধুলো এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখে। আমি বিশ্বাস করি যেকোনো ক্লাবেরই এভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত সমাজের সার্বিক উন্নতির কথা ভেবে।

বহু বছর ধরে আমি সপরিবারে দেশের বাইরে থাকলেও আমার প্রিয় শহরকে দেখতে আসি প্রতি বছর। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরেই দেখি আমাদের পাড়ার নানা

পরিবর্তন। প্রতিবেশীদের উন্নতি আমাকে গর্বিত করে। এটাকে আমার নিজের শহরের প্রতি আমার আত্মিক সম্পর্ক বলেই আমি মনে করি।

আজ এতগুলো যুগ পেরিয়ে আমার প্রিয় মডার্ণ ক্লাবের শুরুর দিনগুলো ভাবতে গিয়ে আবার যেন ফিরে দেখার সুযোগ পেলাম আমার শৈশব ঘেরা প্রিয় মানুষদের মুখগুলো। সেদিনের সেই মুখগুলোর অনেকেই আজ আর নেই। কিন্তু আমার স্মৃতির পাতা জুড়ে আজও রয়েছেন ওঁরা আমার জীবনের আশীর্বাদের মতো। কারণ আমার ছেলেবেলা সমৃদ্ধ হয়েছে ওঁদের সকলের স্নেহ আর ভালোবাসায়।

বছর ঘুরে আসে তার নিজের নিয়মে। ছয় ঋতুর দেশ আমাদের ভারতের সাথে চার ঋতুর দেশ আমেরিকার সার্বিক মিল না থাকলেও, আমাদের শরৎকালের সাথে আমেরিকার ফল ঋতুর অনেকটা মিল। নিজের দেশকে ভালোবেসে বিদেশের মাটিতে আমরা দেশ গড়ার চেষ্টা করি। দুর্গাপুজো করি আমাদের বিদেশের ব্যস্ত জীবনে যতটা সাধ্য তা দিয়ে।

জীবন পাল্টায়। কিন্তু অতীত শেকড়ের মতো জড়িয়ে রাখে সেই জীবনকে। বহু শরৎ জীবনের পথে চলে গেলেও, মনের গোপনে লুকিয়ে থাকা ফেলে আসা ছেলেবেলার দুর্গামায়ের হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখ, ধূপের গন্ধ আর ঢাকের বাদ্যি ---ছেলেবেলার অমলিন সব পুজোর আনন্দের দিনগুলো আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে। অসংখ্য ভালোলাগাকে তুচ্ছ করেও ফেলে আসা দিনগুলোতে মন নিজেকে খুঁজে পেতে চায় বারবার। তাই শেকড়ের টানে জীবনের সেরা সম্পদের মতো নিজের মনেই সাজিয়ে রাখি সোনালি সেই বহুমূল্য স্মৃতিগুলোকে।

মডার্ণ ক্লাবের নির্মিয়মান ত্রিতল ভবন

গল্প

তালিবানের মা

অরুণোদয় সাহা

আফগানিস্তানে তখনও তালিবানদের রমরমা। কারজাই তখনও রাষ্ট্রপতি হননি। তালিবানি সন্ত্রাসে আফগানিস্তানের থরহরি কম্পমান অবস্থা। একজন প্রৌঢ় ধনাঢ্য তালিবানের শরীরটা বেশ কিছু দিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। কাবুলের সবচেয়ে নামিদামি হেকিম ডাক্তার গুলে খাওয়া হয়েছে। তাঁরা ভালো করে দেখেছেন—কিছুই বে-ঠিক নেই। তবু সান্ত্বনার জন্য, ডাক্তারদের মধ্যে একজন এক্স-রে, সোনোগ্রাফি আর মলমূত্র পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্যাথলজি ল্যাবরেটরি থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টগুলো পেতে কয়েকদিন সময় লাগবে। কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা তালিবান পকেট থেকে একটা তার ভিজিটিং কার্ড বের করে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে বলল—ফিস, অন্যান্য টাকা পয়সা সব মিটিয়ে দিয়ে গেলাম। আপনি রিপোর্টগুলো দেখে নেবেন। আর যদি কিছু গোলমাল ধরা পড়ে মেহেরবানি করে আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন। আমি চলে আসব। ডাক্তার ভিজিটিং কার্ডটি ইতিমধ্যে উল্টেপাল্টে দেখলেন— তাতে পর পর পাঁচটা ফোন নম্বর রয়েছে। কোন্‌টায় জানাতে হবে রিপোর্ট? ডাক্তারের সংশয় দূর করার জন্য তালিবান বলল— প্রথম ফোন নম্বরটি আমার প্রথম স্ত্রীর— আমি ওখানে থাকি না। দ্বিতীয়টা আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর। তৃতীয়টা আমার তৃতীয় স্ত্রীর। চতুর্থটা আমার চার নম্বর বিবির—বর্তমানে যার সঙ্গে আমি থাকি। কিন্তু তারপরেও তো আর একটা ফোন নম্বর রয়েছে। সেটি কী? সেটা কার? ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তালিবান তখন দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, এ চার নম্বর বিবির কাছেও আমার সব সময় থাকা হয় না। চিৎকার চেচাঁমেচি

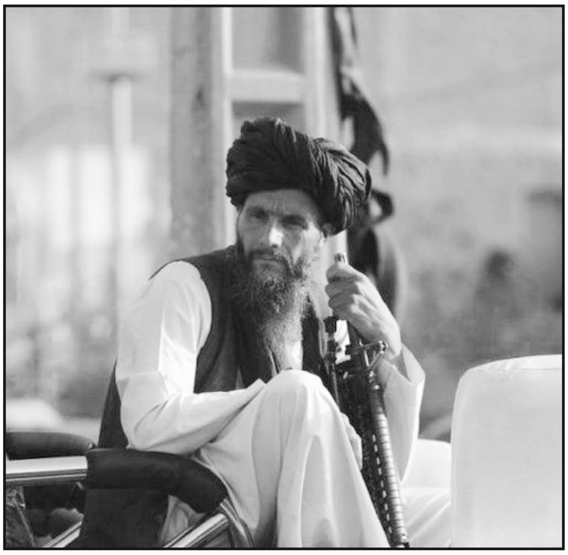

আর অশান্তিতে আমার জিন্দেগি জেরবার। যখন এক দুই তিন চার — কোনও বিবির কাছেই টিকতে পারি না— তখন পাঁচ নম্বর মহিলার কাছে দু'দণ্ড শান্তির জন্যে চলে আসি। এ মহিলা আমার মা। প্রথমে সব জায়গায় ফোন করে কোথাও আমাকে না পেলে---শেষ ফোন নম্বরটিতে ফোন করবেন—আমি সেখানে থাকবই। সংসারে শান্তির বড় অভাব—যদি এখনও কিছু শান্তি অবশিষ্ট থাকে তবে ঐখানে আমি তা খুঁজে পাই। ডাক্তার কী বুঝলেন কে জানে! তবে এটা তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন— এ সংসার বড় কঠিন জায়গা। কট্টর নারীবিদ্বেষী একজন তালিবানকেও শান্তির জন্য শেষ অব্দি মায়ের আঁচল খুঁজতে হয়।

জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনা ও মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য

প্রবন্ধ

অয়ন সাহা

"বন্ধু, আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েকদিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা তো জানই - সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন।......"

জগদীশচন্দ্র বসুকে ভারতবর্ষে আধুনিক পরীক্ষা নির্ভর বিজ্ঞানের প্রবর্তক বললে ভুল বলা হয় না। সুদীর্ঘ বিদেশী শাসনকালে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য যখন লুপ্তপ্রায়, সেইসময় জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব। ত্রিপুরা তখনো ভারতের অঙ্গ নয়। শুধুমাত্র বিজ্ঞানকে ভালোবেসে, ভারতের গৌরবের কথা ভেবে দু'হাত ভরে বিজ্ঞানীকে সাহায্য করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য। জগদীশচন্দ্র ও রাধাকিশোরের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সংক্রান্ত টুকরো টুকরো তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন চিঠিপত্রে, স্মৃতিচারণায়। সেইসব টুকরোগুলো জুড়লে গোটা ছবিটি হয়তো তৈরি হয়না, কিন্তু স্পষ্ট অনুমান করা যায় ত্রিপুরা থেকে সাহায্য না পেলে জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানযাত্রার ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো।

জগদীশচন্দ্র বসু

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। বিখ্যাত প্যারিস প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে এক আন্তর্জাতিক পদার্থ বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিজ্ঞান সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হয়নি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন — "এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে।... দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো ভাঁটা... অগত্যা সে দুঃসময়ে আমার একজন বন্ধুর স্মরণ নিতে হোলো।... তিনি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য।"

সে সময়ে যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের বিয়ের আয়োজন চলছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে পনেরো হাজার টাকার চেক তুলে দিয়ে মহারাজ বলেছিলেন, "বর্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু-এক পদ অলংকার নাই বা হইল। তৎপরিবর্তে জগদীশবাবু সাগর পার হইতে যে অলংকারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন তাহার তুলনা কোথায়?"

প্যারিসের বিজ্ঞান সভাতেই জগদীশচন্দ্র প্রথম তুলে ধরেন জড়ের চেতনা সম্বন্ধে তার বিস্ময়কর উপলব্ধির কথা। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আরেক বাঙালী মনীষী, স্বামী বিবেকানন্দ। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজি লিখেছেন— 'এ বৎসর - এ প্যারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ সমাগত সজ্জনসংগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করবেন আজ এই প্যারিসে। সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর এ জার্মান, ফরাসি, ইংরাজ, ইতালি প্রভৃতি বুধমন্ডলীমন্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে গৌরবর্ণ প্রতিভামন্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন— সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার জেসি বোস। একা, যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্যমন্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন — সে বিদ্যুৎ সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করল। সমস্ত বৈদ্যুতিক মন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর।'

২০ নভেম্বর, ১৯০০ সালের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— 'ত্রিপুরার মহারাজা এখন কলিকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে

তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব — তিনি খুব খুশী হবেন।'

প্যারিস থেকে ইংল্যান্ড। ১৯০১ সালের ১০ই মে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা করলেন জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে সেই বক্তৃতার বর্ণনা করে লিখলেন — "১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। *Bravo*! Bravo! ইত্যাদি উৎসাহ বাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আছে কি? একেবারে নিরুত্তর।.... তুমি মহারাজাকে আমার এই সংবাদ জানাইও। তোমরা যদি আমার এখানে থাকিবার উপায় না করিতে তাহা হইলে আমাকে নিস্ফলপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।"

পরাধীন দেশের এই গৌরবে উল্লসিত রবীন্দ্রনাথ লিখলেন —

বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি, জয়মাল্যখানি সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মন্ডিত
পন্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার।
আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি।
জগৎসভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে!

একটি গবেষণাগারের অভাব জগদীশচন্দ্র তিলে তিলে অনুভব করেছেন। ব্যক্তিগত গবেষণার জন্য কলেজের গবেষণাগারের ব্যবহারে সরকারের আপত্তি ছিল। এই আজীবন লালিত দুঃখ থেকেই ১৯১৬ সালে সারা জীবনের জমানো টাকা দিয়ে তৈরী করেন বসু বিজ্ঞান মন্দির। বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে জগদীশচন্দ্র বলেন— 'ভারতবাসী যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোন দিনই তাহাদের নহে, এই কথা চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই। সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোন দিন হইতে পারেনা তাহাও কতদিন শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে।'

এক পর্যায়ে স্থির হয়েছিল জগদীশ বসুর জন্য চাঁদা তুলে একটি গবেষণাগার তৈরী করা হবে। রবীন্দ্রনাথ দায়িত্ব নিলেন চাঁদা আদায়ের। রাধাকিশোরের কাছে কবির চিঠি এল — 'জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনা সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি — আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য কাহারও দ্বারে দন্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলা যাইতে প্রস্তুত। আমি মহারাজের নির্জন খাসদরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী— আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গ দ্বারা প্রতিহত হইব না। মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব। মহারাজের নিকট পূর্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম।'

এই চিঠির তারিখ ২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৮। সেদিন কবির মেজো মেয়ে রেণুকার বিয়ে। রাধাকিশোর সেদিন কবিকে বলেছিলেন— 'এ বেশ আপনার সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানোই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ যোগায় — আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড় ভিক্ষুক আছে।' এই সংক্রান্ত আরেকটি চিঠি পাওয়া গেছে। এটি কবি লিখেছিলেন আগরতলায় বসে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে।

'বন্ধু, আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েকদিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা তো জানই সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ

করি তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য কার্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন।'

শুধু টাকা নয়, জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার জন্য অন্য ধরনের সাহায্যও গেছে ত্রিপুরা থেকে। ২রা আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "মহারাজের নিকট অধ্যাপক বসুর একটি প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি। অধ্যাপক মহাশয় উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই বর্দ্ধনতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। ত্রিপুরায় মূলী বাঁশ জন্মে— শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাহার পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সদ্য অঙ্কুরিত মূলী বাঁশের চারা মহারাজ যদি সত্বর তাহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাহার বিশেষ উপকার হইবে। পথের মধ্যে অঙ্কুরাগ্র দলিত হইয়া গাছগুলি মরিয়া না যায় সে জন্য প্যাকবাক্সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহার উপরে খাঁচার আবরণ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আপাতত প্রায় ২০/২৫টি গাছ তাহার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার উপদ্রবে এ গাছগুলি মারা গেলে অন্য তাজা গাছের পুনশ্চ প্রয়োজন হইবে, তখন মহারাজ পুনর্বার আদেশ করিয়া দিবেন। কলিকাতার নিকটে এই গাছের সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে তাহার পরীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে।'

১৯২৮ সালে মহারাজা বীরবিক্রমের রাজ্যাভিষেকে আগরতলা এসেছিলেন জগদীশচন্দ্র। রাধাকিশোরের দান সেদিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন বিজ্ঞানী— 'মহারাজ রাধাকিশোরের জীবদ্দশায় আমি তাঁর ঋণ স্বীকার করতে পারিনি তাঁর নিষেধের জন্যে। আজ সেই মহান রাজার অসামান্য বদান্যতার কথা সকলকে জানিয়ে দেবার সুযোগ ঘটলো বলে আমি আনন্দিত। আমি আজ মুক্তকণ্ঠে আমার অসীম কৃতজ্ঞতার কথা বলতে চাই।'

তারপর পেরিয়ে গেছে বহু বছর। ২০০৬ এর ৩০ নভেম্বর। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন মহারাজ বীরবিক্রমের পুত্র কিরীটবিক্রম মাণিক্য। প্রথমবারের মতো ত্রিপুরার মহারাজারকোনো সন্তান যোগ দেবেন এই বিশেষ দিনটির উদ্যাপনে। কিন্তু তা আর হলো না। দু'দিন আগে ২৮ নভেম্বর মারা গেলেন কিরীটবিক্রম মাণিক্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য

এই পুকুর পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের জন্য লড়াই করছে মডার্ণ ক্লাব

মনিকা দেব

"এই যে বুলবুলির মা, কই যাও ?"

"কে ডাকছো ?"

"আরে আমি ! মধ্য পুষ্করিণী। দেখতে পাচ্ছো না? দেখবেই বা কিভাবে ? আবর্জনায় ঢাকা পড়ে আছে আমার জল। চারিদিকে নোংরার স্তূপ। আমাকে তো এখন আর পুকুর বলেই চেনা যায় না।"

"আরে তুমি! বলো বলো কি ব্যাপার ? আসলে বুলবুলিকে স্কুল থেকে আনতে যাবো, তাই একটু তাড়া আর কি। কি বলবে বলো তাড়াতাড়ি।"

"না। না। যাও। আমার বলার কিছু নেই। তবে শুনো, এই যে মেয়েকে আনতে গলির রাস্তাটা দিয়ে সর্টকার্টে দৌড়ে ছুটছো, জানো এই জায়গাটাও আমার ছিলো। আমার পশ্চিম পাড়ের জল ভরাট করেই গলি রাস্তাটা হয়েছে। তোমাদের সবার উপকার হবে ভেবে আমি কিচ্ছুটি বলিনি। আজ আমার করুণ দশা। নোংরা, আবর্জনায় জল নষ্ট হয়ে মরতে বসেছি আমি।"

"ঠিকই কইছো। নাকে রুমাল না দিয়া তোমার কাছ দিয়ে যাওয়াই যায় না। বুলবুলি তো তোমার পাড় দিয়ে যেতেই চায় না। কি অবস্থা তোমার চার পাড়ের !"

"এমন অবস্থা ছিলো না গো বুলবুলির মা। তোমার শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করে দেখো। তখন নাগেরজলা মেটারস্ট্যান্ড হয়নি। অনেকদিন আগের কথা। সারা পাড়ার মধ্যমণি ছিলাম আমি। সবাই আমাকে মধ্য পুষ্করিণী বলে ডাকতো। আমার টলটল জলে স্নান করে তৃপ্তি পেতো পাড়ার মানুষ। সর্দারপুকুর ভরাট করে বাড়িঘর হয়ে যাবার পর আমি ছাড়া এই এলাকার আর কোনো পুকুর নেই। পাড়ার ছেলেরা দাপিয়ে স্নান করতো। অনেকেই বাড়িঘরের কাপড় চোপড়, থালাবাসন ধুতেন আমার পরিষ্কার জলে। সমস্ত মাঙ্গলিক কাজের জন্য আমার ঘাটেই আসতেন সবাই। রাতবিরেত শ্মাশানঘাট থেকে ফিরে আমার জলে ডুব দিয়েই বাড়ি ফিরতেন।"

"বুলবুলি কয়, তুমি এখন বুড়ি হয়ে গেছো। তোমার জল এখন আর কোনো কামের না।"

"বলবেই তো। কতো বছর ধরে অবহেলায় পড়ে আছি আমি। তোমরা মানুষরাই যদি আমার যত্ন না নাও, নজর না রাখো তো আমি কেন — সব পুকুরেরই একই দশা হইবো।"

"বুলবুলির বাবা বুলবুলিরে কইছে তোমার বুকে মডার্ণ ক্লাবের সাঁতার কম্পিটিশন হইতো। বুলবুলির বাবাই নাকি ফাস্ট হইতো প্রতি বছর। আমার মেয়ে তো শুনে অবাক হয়ে কয় এমন পচা জলে কি করে সাঁতার কাটতো তারা ?"

"বুলবুলি তো আমার আগের রূপ দেখেনি। তারে কইও তোমার বিয়ের জল যে আমার ঘাট থেকেই ভরা হয়েছিলো।"

"আচ্ছা কমু। এখন যাই। বুলবুলির স্কুল ছুটি হইয়া যাইবো।"

"আর একটু শুনো। বুলবুলিরে শিখাবে একটি পুকুর

কিভাবে পরিবেশকে সুন্দর ও নির্মল রাখতে সাহায্য করে এবং জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র ধরে রাখে। আগুন নেভানোর কাজসহ এলাকার মানুষের কতোরকম উপকারে আসে একটা পুকুর সেটাও নবীন প্রজন্মকে জানাইও।”

“বুলবুলির বাবা বললো তোমাকে রক্ষা করতে নাকি লড়াই চলছে।”

“হ্যাঁ। ঠিকই শুনছো। মডার্ণ ক্লাবের ছেলেরা নেমেছে। তারা চাইছে আমার জল যাতে আগের মতোই এলাকার সবার কাজে লাগে। তারা এলাকায় সত্যিই একটি পুকুরের গুরুত্ব অনুধাবন করে। আমাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আগরতলা পুর নিগম, রাজ্য সরকার সবার সাথে দফায় দফায় আলোচনা করে চলছে। ডেপুটেশন দেয়াসহ নানাভাবে পুর নিগম ও সরকারকে বাধ্য করার চেষ্টা করছে আমার চার পাড় বাঁধিয়ে একটি সুন্দর পুকুর হিসাবে আমাকে গড়ে তোলার। আমার জলকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি চারদিকে হাঁটার ব্যবস্থা করতে চাইছে তারা। এ কাজে এখন পর্যন্ত অনেকটাই সফল মডার্ণ ক্লাবের ছেলেরা। সরকার আমার সৌন্দর্যায়নের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। শেষ পর্যন্ত কাজটা কতটুকু সফল হবে জানি না। তবে আমি চাইছি পরিবেশের স্বার্থে, এলাকার মঙ্গলের জন্য আমার হৃতগৌরব ফিরে পেতে। কার জমি... কে মালিক... তা আমার ভাবার বিষয় নয়। বিশুদ্ধ জল নিয়ে আমি মধ্য পুষ্করিণী হয়েই সবার জন্য বেঁচে থাকতে চাই। মডার্ণ ক্লাবের ছেলেরা আমার পাশে আছে। জয় আমার হবেই। শুধু একটাই মিনতি, এলাকার সবাই ক্লাবের পাশে থেকো। আমি বাঁচলে সবারই উপকার। তোমাদের স্বার্থেই আমাকে বাঁচাতে হবে।”

“ঠিক বলেছো। আমি বুলবুলিকে স্কুল থেকে নিয়া আসি। বিকালে সবার বাড়ি বাড়ি যাবো। প্রত্যেককে বুঝাবো এলাকার স্বার্থে মধ্য পুষ্করিণীকে বাঁচাতেই হবে। পুকুর বাঁচানোর মডার্ণ ক্লাবের আন্দোলনে আমরাও সর্বতোভাবেই থাকবো।”

পুকুর সংস্কারের জন্য মধ্য পুষ্করিণীর
আইনি দখলদারদের অন্যতম
মিহির চক্রবর্তী আগরতলা পুর নিগমের
দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মৌলিকের কাছে
প্রয়োজনীয় নথি তুলে দিচ্ছেন।

অবহেলার শিকার ভট্টপুকুর সংস্কারে সরব এলাকাবাসী

আগরতলা

১৮ আগস্ট ঃ অভিভাবকহীন ভট্টপুকুর আজ অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। এ পুকুর রক্ষার দায়িত্বে এগিয়ে এলো এলাকার সচেতন নাগরিকরা। শহর দক্ষিণাঞ্চলে উত্তর বাধারঘাট এলাকার মডার্ন ক্লাবের পেছনে ভট্টপুকুরের অবস্থান। টিলাভূমিতে থাকা এই একমাত্র পুকুরটি অবহেলা আর অযত্নের শিকার হয়ে আজ ধ্বংসের পথে। অথচ এই পুকুরটি এলাকাবাসীর কাছে অন্ধের যষ্ঠি হিসাবে চিহ্নিত। এলাকাবাসীর স্নান, মাঙ্গলিক কাজকর্ম, গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ এলাকার অগ্নি নির্বাপণের একমাত্র ভরসা হলো এই ভট্টপুকুর। অথচ বর্তমানে ভাঙছে পুকুরের পাড়। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাস্তা। এছাড়াও পুকুর পাড়ে অবস্থিত বাড়িঘরগুলো আজ হুমকির মুখে। যে কোনও মুহূর্তে পুকুরের পাড় ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বাড়িঘর। কিন্তু এই পুকুর রক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে দায়ী করেছে এলাকাবাসী। তারা জানান যে, ইতিপূর্বে তারা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের গোচরেও বিষয়টি আনেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এরপর ত্রিশ জুন আগরতলা পুর পরিষদের মেয়রের হাতে একটি আবেদন পত্র তুলে দেন। এ সময় এলাকার এক প্রতিনিধি দল মেয়রের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এএমসির সাউথ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, নির্বাহী বাস্তুকার জয়দেব চক্রবর্তী, সমাজসেবী সজল চক্রবর্তী সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

সেই সময় সদর এসডিএম, মেয়র, পুর পরিষদ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা পুকুরের করুণ অবস্থা দেখে যান এবং এলাকাবাসীর সাথে সহমত পোষণ করেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন। এরপরও ভট্টপুকুর সংস্কারের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। শেষ পর্যন্ত সতেরো আগস্ট পুকুর সংস্কারের জন্য এক গণডেপুটেশন সদর এসডিএম অসীম সাহার হাতে তুলে দেন এলাকার সমাজসেবী সজল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকাবাসী ও মডার্ন ক্লাব সদস্যদের নিয়ে সরকার কর্তৃক পুকুরটি অধিগ্রহণে, সংস্কার ও সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান সমাজসেবী সজল চক্রবর্তী।

পুকুরের জন্য মডার্ণ ক্লাবের লড়াইয়ের
খবর সংবাদপত্রের পাতায়

কবিতা

পরিবর্ত

মানস পাল

কাল ঘর ভেঙেছিল
কাল ঝকঝকে নীলে ঝড় উঠেছিল
কাল অসম্ভব ফুঁসেছিল ঢেউ

আজ শান্ত শিবির —
নীল থেকে ঠিকরে পড়ছে রোদ
সবুজ ঘাসের বুকে তারই মুক্তোমালা

আজ প্রকৃতই অরণ্যসংগীতের দিন।

চিরন্তন স্বাধীনতা

রাতুল দেববর্মণ

বাঁকা পথে যেওনা ঋজু পথে যাও
বিপথে কেউ চলে গেলে তাকে জাগাও
কত পথ এসে যাবে দৈবদুর্বিপাকে
ভয়ে থমকে দাঁড়াবেনা যাক এঁকেবেঁকে
বাতাসে ভাসে যেন বেহাগের সুর
হারিয়ে ফেলেছি বুঝি ভৈরোঁ ভোর

তবু হাওয়ায় তরঙ্গ দোলে
পাখি ওড়ে মত্ত নীল ডানা মেলে
ফিরে পাব ঠিকানা পৃথিবীর কোলে
অনন্ত রৌদ্রের পথে হাঁটি মিছিলে

শাশ্বত রাত্রির বুকে বৃন্দগান গাই
রুক্ষ জমিনে চিরন্তন স্বাধীনতা ফিরে পাবই ।

বিবেক কেমন আছো

পীযূষ রাউত

একবার অন্তত নিজেকে প্রশ্ন করো
বিবেক কেমন আছো?
নিরন্তর বয়ে যায় বয়ে যায় সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা।
জিভ- আলজিভ মৃত মানুষের মতো,
জড়ো বস্তুর মতো স্থির হয়ে আছে।
বিবেক, যা প্রকৃত, যা সত্য তা
উচ্চারণে এতো দ্বিধা কেন?
তোমার রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখাবয়ব,
ভয়কাতুরে দৃষ্টি কী
দেখছে ইতিউতি এদিকওদিক
কী দেখছে?
মানুষ নাকি মানুষের ছদ্মবেশে হায়েনার দল?
বিবেক, থাক, মুখ ফুটে বলতে হবেনা কিছু।
তবে একবার অন্তত নিজেকে প্রশ্ন
করো, তুমি কেমন আছো?

তালের বড়া

দিলীপ দাস

সুপক্ক তালের মতো আপনি
ব্যবসায়ীর ক্যাশবাক্সের উপর আরাম করে বসে আছেন।
আপনাকে দেখিয়ে চতুর ব্যবসায়ী
প্রচুর তালের বড়া
বিক্রি করছে।
যে তালের বড়ায় একফোঁটাও তালরস নেই।
দেদার মুনাফা আছে।

আমরা কেউ একা নই

অপাংশু দেবনাথ

এ যাবৎ কেউ একা করতে পারেনি
আমাকে,আমাদেরকে।
আমি নিজেই ভেতরে ভেতরে একা হই
বৃষ্টি আনি
জেগে উঠলে রোদ।
ঝরলে ঘাম,
শীত শীত অনুভব নামাই শরীরে।

কীটসন্ধ্যায় যে কোনো বাগিচায়
ইচ্ছে করেই হারালে পথ
অথবা নামলে ঘন কুয়াশার মাদকতা,

নীল আকাশে একা পাখিটি ডেকে ডেকে রোজ
মেঘরঙে মিলিয়ে গেলে
অন্ধকার চিঁড়ে কোনো বাঁশিওয়ালা বিরহ বাজালে হৃদয়ে,
কিংবা ভাতের থালায় দুঃখ বেড়ে নিয়ে বসে

বাথরুমে অবেলায় স্নানের সময়
খুব একা হয়ে যাই।

তখন তোমাকেই তো মনে পড়ে প্রিয়
পান্তা ভাতের মতোন
রাহতের রাগিনীর সুরে।

বৃষ্টি ভেজা মন

শেখর সি. দত্ত

আজ অনেকদিন বাদে
শহরের সহস্র ভীড়ে
চোখ স্থির একটি চেহারায়,
আমার অপ্রকাশিত প্রেম
কথা বলে অন্তরে।
তপ্ত দুপুরে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গতায়
প্রশ্ন আঁকি রোদের গায় –
একি!
তার ললাটে অন্য অভিজ্ঞান।
প্রেমিক মন উঁকি মারে নিঃশব্দে,
বারবার দেখার তৃষ্ণা
চোখ ফেটে আসে।
সে যেতে যেতে নিষেধের পাহারাতে
তবুও পিছন ফিরে চেয়েছিল।
তখন বৃষ্টি হয়েছিল
মনের জানালা দিয়ে
ভিজে গিয়েছিল
আমার সব অভিলাষ।

রূপকথার ছোট্ট স্বপ্ন

গল্প

অলক দাশগুপ্ত

বড়মুড়া গ্যাস থার্মাল প্রোজেক্টের উল্টোদিকে হাইওয়ের পাশে সরকারি জমিতে ছিল অতীনের ছন- বাঁশের ভাতের হোটেল। সেখানে রেশনের মোটা চালের ভাত, হলুদ গুলে বানানো মুসুর ডাল, খুনখারাপি ঝাল সিঁদল চাটনি, আলু মুলো ডাঁটা পাতা-লতা দিয়ে বানানো সবজি, চালানি মাছের ঝোল, ব্রয়লার মুরগি আর শুয়োরের মাংস পাওয়া যেত। এসব কেউ খেতে না চাইলে অতীনের রাগী বউটা খদ্দেরের জন্য পেপার অমলেট বানিয়ে দিতো। পেপার অমলেট নতুন কোনো আইটেম নয়, সবচেয়ে পাতলা ফিনফিনে আর মুচমুচে দোসাকে পেপার দোসা বলে কিনা তাই আমি ওই অমলেটের নাম দিয়েছিলাম পেপার অমলেট। নামটা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিখ্যাত হয়ে যায় অতীনের বউয়ের পেপার অমলেট' নামে, নিঃসন্দেহে শেফের নামের প্রতি অবিচার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের!

> **"গৌহাটি থেকে আসা শেরওয়ালি ট্র্যাভেলসের নাইট সুপার থেকে ধবধবে পোশাক পরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পায়ের চকচকে স্যু এতোদূর থেকে জেল্লা মারছে। চোখে কালো সানগ্লাস, মাথায় আসমানী রঙা ক্রিকেট ক্যাপ। নেমেই ফস করে লাইটার জ্বেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে কায়দা করে কাটা ধোঁয়ার রিং শূন্যে ছুঁড়ে গটগট পায়ে অতীনের হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ..."**

যাক এ কিছু খাওয়া দাওয়ার গল্প নয়। অতীন নিজেই গরিব মানুষ ছিল। বড়মুড়া জঙ্গলের গাছ কেটে বানানো তক্তার বেঞ্চিতে গরিবি হালের অ্যাম্বিয়েন্স ছিল তার হোটেলের। তার গিন্নি রাঁধতো। ছেলেমেয়েরা পরিবেশনে হাত লাগাতো। খদ্দেররাও বেজায় গরিব ছিল। অধিকাংশ রাস্তার দিনমজুর, কাঠুরে আর উটকো পাবলিক। ট্রাকের ড্রাইভার, হ্যান্ডিম্যানরাই ছিল অতীনের সবচেয়ে মান্যগণ্য কাস্টমার। হোটেলটায় আসল ভিড় হতো বিকেলের পর। পাহাড় শেষ হলেই যে গ্রামটা। সেই হাওয়াইবাড়ির কান্ট্রি লিকারের তখন আকাশছোঁয়া নামডাক ছিল। সে মদ প্লাস্টিকের জারিক্যানে কিনে এনে অতীন তাতে জল, দোক্তা পাতার রস, ঘুমের ট্যাবলেট আরো অজানা কিসব মিশিয়ে ফেমাস হয়েছিল। এভাবে একটু একটু করে সে সচ্ছল হতে থাকে, সেই সময় একজন কর্মচারীকে সে নিয়োগ করে।

টেকো, কালো, রোগা লিকলিকে, বুকের সব হাড় বের করা এবং একটি পা অন্যটির চাইতে খাটো কেষ্ট অতীনের হোটেলে জয়েন করে। মুখে সারাক্ষণ গ্যালগ্যালে হাসি, সামান্য ক্যাবলা টাইপের তবে খাটিয়ে লোক। যাবতীয় কাজকর্ম নেংচে নেংচে তাকে করতে হয় ওই রান্না ছাড়া। লোকটার সম্ভবত বাড়িঘর, নিজের লোকজন কেউ ছিল না। কেষ্টর অবস্থা শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারে নিপীড়িত বউটির চাইতেও খারাপ। সারাক্ষণ অতীনের বউ তাকে অশ্লীল গালাগালি করে, অতীন রোজ রাতে চোলাই খেয়ে তাকে আচ্ছাসে পেটায়, এমনকি অতীনের ক্লাস এইটে পড়া লায়েক ছেলে অবধি মাঝেমধ্যে পাঞ্চিং ব্যাগ হিসেবে তার পেটে দুমদাম ঘুষি মেরে ঠা ঠা করে হাসে। রোগাভোগা লোকটা আর্তনাদ করে পেট চেপে মাটিতে বসে পড়লেও কারোর তাপ উত্তাপ নেই। অতীন তখন দূরের পাহাড় মুগ্ধ চোখে দেখে, তার বউ ডালে পাঁচফোড়ন ছাড়ে। অন্য ছেলেমেয়েরা দাদাকে উৎসাহ দিতে দিতে লাফায় ঝাঁপায়।

বাইরের কেউ কিছু বলতে গেলে অতীন হাত তুলে থামিয়ে দেয়--- আরে দাদা ইডা হইল বদমাইসের হাড্ডি। আকম্মা তার উপর আবার চুর। চক্ষের নিমেষে জিনিস সরাইতে ওস্তাদ। ইতানরে শক্ত মাইরের উপরই রাহন লাগে।

হাবেভাবে অতীন জানাতে কসুর করে না যে কর্মচারীকে মারধর করা মালিকের 'মৌলিক অধিকার'! কতো বেতন কেউ জানে না, আদৌ বেতন পায় কিনা সেটাও সন্দেহ। কেষ্ট বেচারা দিনরাত খাটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর পেটে ভাতে এবং রুটিন পেটাই হজম করে বোকা বোকা হাসি মুখে ঝুলিয়ে চাকরি করে। এদিক-ওদিক থেকে অনেকেই মনে করে কেষ্টার অবস্থা যা দেখা যায় তারচেয়েও ঢের খারাপ। অতীনের যা মাস্তানসুলভ আচার-আচরণ তার স্বভাবচরিত্র ভালো হওয়া সম্ভব নয়। ফিসফিস আওয়াজ ওঠে, কেষ্টকে অনেকেই 'অতীনের নতুন বউ' বলে ডাকে আড়ালে।

আমি কেবল মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্ত হতাম কেষ্টর উপর। কেন সে এখানে এতো অপমান, মারধর সয়ে পড়ে থাকবে? ওর কি বিন্দুমাত্র মান সম্মান জ্ঞান নেই, দেশে কি কাজের এতো অভাব? এতোকাল গল্প-উপন্যাস পড়ে এবং সাম্যবাদী রাজনৈতিক পার্টির দাদাদের কথায় বিশ্বাস করে আমার ধারণা

জন্মেছিল কেবলমাত্র বড়লোকেরাই অসহায় দরিদ্র মানুষের উপর অত্যাচার করে, কেষ্টার দুঃখময় জীবন খুব কাছ থেকে দেখে আমার সেই ভুল ধারণা ভেঙে যায়। বুঝতে পারি বড়লোক-গরিব এসব সব ভোগা। আসল ব্যাপার মানুষ সুযোগ পেলেই অন্য মানুষের উপর জুলুম করতে পছন্দ করে। যেমন রগচটা অতীনের ফেভারিট হবি সফট টার্গেট কেষ্টাকে রোজ রোজ মারধর করা!

আমাকে খুশি করে কেষ্টা অবশেষে একদিন বিদ্রোহ করে। ব্যাপক মারধর খেয়ে মালিকের ব্যাটার 'জাস্ট ফর ফান' মার্কা কয়েকটি বাঘা ঘুষি পেটে সইয়ে চটেমটে তক্ষুণি পদত্যাগ করে। একটি থলেতে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে সে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে সোচ্চারে বারবার ঘোষণা করতে থাকে— কেষ্টারে তুমরা খুব ফ্যালনা ভাবসো! ভাবসো কেষ্টারে যখন খুশি মাইরধর, অপমান করন যায়! কেউ চিনাজানা নাই দেইখ্যা রুজ রুজ মাইরধর কইরা অপমান কইরা পার পাইয়া যাইবা? তুমরা তো জান না কতো বড় বড় মস্তান আমার বন্ধু। টের পাইবা, টের পাইবা এহন আগরতলা গিয়া আজকা রাত্রের নাইট চুপারেই গৌহাটি যামু গা। এক বছর পর যখন সাদা ফকফইক্যা শার্টপ্যান্ট পইরা চকচইক্ক্যা বুটজুতা পাও চানগ্লাস চোখে দিয়া নাইট চুপার থেইক্যা ইহানে নামুম তখন তুমরাই কইবা কেষ্টা একটা ব্যাডা আছল, বিরাট বড় ব্যাডা।

যতোক্ষণ না বাস এলো কেষ্টা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এই কথাগুলোই বারবার রিপিট করছিল রাগে কাঁপতে কাঁপতে, চোখের কোণে জমা জল বারবার হাতের চেটো দিয়ে মুছতে মুছতে। উল্টোদিকে অতীনের হোটেলে তখন শ্মশানশান্তি, কেউ তেড়ে অবধি এলো না! বাস এলে কেষ্টা হ্যাঁচড়প্যাঁচোর করে উঠে চলে গেল।

বছর দেড়েক পরের উন্মনা এক বসন্তের দুপুর। এলোমেলো বাতাসে বনস্থলী তোলপাড়, কোথাও একটা কোকিল ডাকছে, গ্যাস থার্মাল প্রোজেক্টর গুম গুম চাপা শব্দ। ঝকঝকে আকাশে একটা চিল ডানা মেলে ঘুরপাক খাচ্ছে। কাস্টমার কেউ নেই, জানলা দিয়ে অলস চোখে তাকিয়ে আছি সামনের জাতীয় সড়কের ওপারের বনের দিকে ...

গৌহাটি থেকে আসা শেরওয়ালি ট্র্যাভেলসের নাইট সুপার থেকে ধবধবে পোশাক পরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পায়ের চকচকে স্যু এতোদূর থেকে জেল্লা মারছে। চোখে কালো সানগ্লাস, মাথায় আসমানী রঙা ক্রিকেট ক্যাপ। নেমেই ফস করে লাইটার জ্বেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে কায়দা করে কাঁটা ধোঁয়ার রিং শূন্যে ছুঁড়ে গটগট পায়ে অতীনের হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে একটা বেঞ্চের ধুলো ঝেড়ে বসেই তুড়ি বাজিয়ে পেল্লাই হাঁক জুড়লেন— একটা ডবল ডিমের পেপার অমলেট, ক্যুইক ক্যুইক। বলে টুপি খুলে সানগ্লাস নামাতেই চারপাশের লোকজন ছুটে এলো। আমিও গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি সবাই বেজায় খাতির করছে কৃষ্ণকান্ত বাবুকে। তিনি নাকি গুয়াহাটিতে বিশাল ফাইভ স্টার হোটেলে চাকরি করেন! খুব খোসামোদ করছে অতীন আর তার বউ— কৃষ্ণদা দুপুরে চাইরডা ডাইল-ভাত খাইয়া যাইবেন নইলে মনে কষ্ট পামু। আমরা গরিব আত্মীয়।

কেষ্টা দেখি হেব্বি বোলচাল ঝাড়ছে, চারপাশে ভীড় করে থাকা মানুষজন হাঁ করে তার ভাষণ গিলছে।

— এই স্টেইটে কুনু ভবিষ্যৎ নাই বুঝলা, কুয়ার ব্যাঙ হইয়া না থাইক্যা বাইরে যাইতে হইব। বাইরে বহুত কামকাইজ, পথেঘাটে ট্যাহা উড়ে, ঠিকঠাক ধরন জানন লাগে। দুইদিনেই তুমি রাজা, কেবল দ্যাশ ছাইড়া বাইরনের হিম্মত থাকন লাগে, সাহস বুঝলা সাহস।

বলে ঘাড় ঘুরিয়ে অতীনের বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে— তুই চল আমার লগে গৌহাটিতে। জি এম সাহেব আমারে চোখে হারায়। নার্সিং হোমে রাইখ্যা আমার ঠ্যাং অপারেশন করাইয়া ঠিক করাইয়া দিসে কম্পানির টেহায়। ফাইভ ইস্টার হোটেলের বেতন, সুযোগ-সুবিধা ভালা। হের একটা ব্যবস্থা আমি ঠিক কইরা দিমু, জি এম সাহেব আমার কথা ফালাইতে পারতো না।

অতীন নুয়ে পড়ে আর তার বউ ধরা গলায় বলে — আপনি মানুষ না ও কৃষ্ণদা দ্যাবতা দ্যাবতা ...

কেষ্টা ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ে সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতোর নিচে ঘষতে ঘষতে বলে — আরে ধুর, মানুষ মানুষের লেইগ্যা না করলে কেডা করব? তার উপর তুমরা ত আমার পর না, দ্যাশের মানুষ।

এলোমেলো বসন্ত বাতাসে বনস্থলী তোলপাড়। নীল ঝকঝকে আকাশে একটা চিল ডানা ছড়িয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। থার্মাল মেশিনের চাপা গুম গুম শব্দ ঢেকে দিয়ে কোনো এক কোকিল একটানা ডাকছে। বড় নিস্তরঙ্গ অলস দুপুর, আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনে মনে কেষ্টর প্রত্যাবর্তনের ওইসব কাল্পনিক দৃশ্যের কথা ভাবছিলাম, যদি কেষ্টা ঠিকঠিকই একদিন মাথা উঁচু করে ফিরে আসে ... ইচ্ছে পূরণের নিটোল মিষ্টি এক গল্পের নায়কের মতো ...

একটি মানুষ কতো সামান্য তার উচ্চাশা, জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য হিসেবে সাদা ধবধবে শার্টপ্যান্ট পরে, চকচকে স্যু পায়ে, চোখে সানগ্লাস এঁটে তাকে মানুষ না ভাবা অত্যাচারীদের দেখিয়ে যাবে তারও মানসম্মান বলে কিছু আছে, সেও বাতিল মানুষ নয় অথচ এটুকু স্বপ্নও কতো মানুষের পূর্ণ হয় না! গোটা একটি আপাদমস্তক অপমানিত জীবনের কাছ থেকে কি এইটুকু খুব বেশি চাওয়া?

আমি তারপর আরো ছয় বছর ওখানে পোস্টেড ছিলাম। কেষ্টা ফিরে আসেনি কোনোদিনই ....

গল্প

দুগ্গা..দুগ্গা..

পি এস দেব

"হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন ? রঙিন লাইট কি আর দেখিসনি ?' — কেতুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে রাস্তা পার করে কটমটিয়ে তাকিয়ে বলে দুগ্গা।

ছোট ছেলে কার্তিককে আদর করে কেতু বলেই ডাকে সবাই। বড় ছেলে গণেশ ও দুই মেয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে বাইরে বেরুলে তেমন সমস্যা নেই। কেতুও ভালো। দেখতে সুন্দর। স্মার্টও। সমস্যা একটাই, আশপাশের সব খুঁটিয়ে জানতে চায়। প্রশ্নবাণে ব্রেইন একেবারে ঝালাপালা করে তোলে।

দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে রাজপথ ধরে ছুটছে দুগ্গা। আশ্বিন মাস। গরমটাও বড্ড। আর এম এস চৌমুহনীর দিকে মায়ের সাথে দ্রুত পা চালাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। কেতুর যেন রাস্তার দু'ধারেই সব আগ্রহ। অনেক পথ হাঁটতে হবে। কেনাকাটা আছে প্রচুর। যেতে হবে মণ্ডপে মণ্ডপে। হাতে সময় কম। কেতুর জন্য পথ চলা একটু শ্লথ হচ্ছিল। দাদা গণেশ বুঝতে পারে ছোট ভাইয়ের কৌতূহলটা।

"ওরে আগরতলা এখন স্মার্ট সিটি হচ্ছে। মোড়ে মোড়ে বসেছে বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল। রাস্তায় রাস্তায় আলোকসজ্জা। উঠছে একের পর এক বহুতল। শপিং মলের ছড়াছড়ি। এরমধ্যে এ বছর দেশের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর

পূর্তিতে অমৃত মহোৎসব পালন করা হলো ঘটা করে। সুন্দর করে সাজানো শহরটা। তিলোত্তমা হয়ে উঠছে রাজধানী আগরতলা।”– ভাইয়ের পিঠে হাত রেখে বলে গণেশ।

ওরিয়েন্ট চৌমুহনী পৌঁছে গেছে মা, ছেলেপুলেরা। “দিন দিন কত্ত সুন্দর হচ্ছে আগরতলা”— চারদিকে তাকিয়ে বলে কেতু। ভাইয়ের কথায় সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে হাসে দাদা।

শুধু মহাদেবই আসেনি। পাহাড়ের বাড়িতেই আছে। সারা বছর সংসারের ঘানি টেনে ক'দিনের জন্য দুগ্গার বেড়াতে আসা। সঙ্গে চার ছেলেমেয়ে। স্বামী এলে একটু সাহায্য হতো। অনেক বলেও কোনোবারই অনেতে পারেনি। স্বামীর উপর একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ে দুগ্গার।

শহরে ভিড়। গরমে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে দুগ্গার কপালে। কোন্ দিকে যাবে চিন্তা করছে। লক্ষ্মীর পছন্দ মেট্রো বাজার। সরস্বতীকে বাড়িতে সরু বলে ডাকে সবাই। সে চায় রিলায়েন্স ট্রেন্ডস- এ যেতে। শপিং মল আবার তেমন পছন্দ নয় দুগ্গার।

সামনেই একটি পুরোনো বনেদি কাপড়ের দোকানে ঢুকে তারা। শাড়ির বিপুল আয়োজন দেখে ঝলমলিয়ে উঠে তিন জোড়া লেডিস চোখ। কত্ত রকমারী শাড়ি। পাহাড়ে এমন সুন্দর ডিজাইনের কাপড় পাওয়া মুশকিল। শান্তিপুরী হ্যান্ডলুম, বুটিক এসব শাড়ি বেশি পছন্দ হয় মা ও দুই মেয়ের। ফুলিয়া তাঁত, ফুলিয়া জামদানিও পছন্দ। হালফিলে ট্র্যাডিশন্যাল শাড়িই ফ্যাশন। জারদৌসির মতো চাকচিক্যে ভরা শাড়ির দিকে ঝোঁক এবার কম। মা-মেয়েরা শাড়ি চয়েস করতে করতে বলছিল।

দোকানে তাকের প্রায় সব শাড়ি ততক্ষণে নেমে গেছে মা ও দুই মেয়ের সামনে। পর্বত প্রমাণ শাড়ির স্তূপ থেকে দুগ্গা নিজের জন্য কাঁথা স্টিচের একটি পিউর সিল্ক নেয়। রাজস্থানের ট্র্যাডিশন্যাল শাড়ি বলে পরিচিত বন্ডেজ শাড়ি নেয় লক্ষ্মী। সিফনের উপর মোগা সুতার সোনালী কাজ করা শাড়িটি প্যাক হয় সরুর জন্য। পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানেও অন্য ডিজাইনের শাড়ির খোঁজে তল্লাশি চলে।

শাড়ির দোকানের পথ মাড়ায়নি কার্তিক-গণেশ। সোজা মোবাইল ফোনের শো-রুমে হানা দেয় দুই ভাই। শো-রুমে আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো নানা রকমের মোবাইল ফোন সেট। ১২৪ জিবি মেমোরির একটি সেটের দাম শুনে ভিমড়ি খাবার জোগার গণেশের। ইনস্টলমেন্টে পাওয়া যায় কিনা তা একটু যাচাই করে দেখছে কেতু। গণেশ বরাবরই অল্পেতে সন্তুষ্ট। ৩২ জিবি মেমোরির একটি সেট পছন্দ হয়। টাকার থলির ওজনটা অনুভবের চেষ্টা করে গণেশ। দাম সাধ্যের মধ্যেই। নিয়ে নেয় গণেশ।

এদিকে, শো-রুমের ম্যানেজারের সাথে কথা চালিয়ে যাচ্ছে কেতু। “প্রতি বছর আসি। এত দাম দিয়ে সেটটা নেবো , কিস্তিটা একটু কম করুন প্লিজ”— কথায় কাজ হয়। দুই ভাই মহানন্দে বেরিয়ে আসে মোবাইলের শো-রুম থেকে।

লক্ষ্মী কখন থেকে ফোন করে চলছে। লাইন কেটে যাচ্ছে বারবার। “এখানেও নেটওয়ার্কের জ্বালা”— বিরক্তির স্বরে বলে গণেশ। কিছুটা হাঁটতেই মা ও বোনদের সাথে দেখা। গাদা গাদা শাড়ির প্যাকেট হাতে যেন উড়ে আসছে।

“দাদারে কত্ত ভালো ভালো শাড়ি। আমাদের পাহাড়ে এমন দামে এই শাড়ি পাওয়াই যাবে না”— খুশীতে ডগমগ করে উঠে সরুর মুখ।

এক গাছি চুল কপালে টেনে আনে সুরু। ঘাড়টা একটু কাত করে। আকাশের দিকে তুলে ধরে মোবাইলটা। দুই গাল দুইদিকে প্রসারিত হতেই মোবাইলের “খ্যাচ ... খ্যাচ ...” শব্দে সেলফি নিয়ে নেয় সরু। এক বছর পর আগরতলায় এসে শহরটা দেখে ভালো লাগছে তারও। ছবিগুলো এফ বি, ইনস্টাগ্রাম, ট্যুইটারে আপলোড করতে করতে সরু এগিয়ে চলে।

চারিদিকে দোকানপাটে বেচা-কেনার ধুম দেখে ভীষণ ভালো লাগে লক্ষ্মীরও। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বরাবরই টান তার। এটা-ওটার দাম জিজ্ঞেস করতে করতে পথ হাঁটে লক্ষ্মী।

কখন থেকেই দু'বোনের পেছন নেয় দুই ছোকরা। বিষয়টি নজর এড়াইনি দুগ্গা ও গণেশের। চোখে কেতুকে ইশারা দেয় দাদা। কেতু পোজ নিতেই ভিড়ে মিশে যায় ছোকরা দু'টি। দাঁত চেপে দুগ্গা বলে — “অসুরের দল।”

বেকারীর নামটা “লক্ষ্মী” বলে লক্ষ্মীর খুব পছন্দ। প্রতি বছরই “লক্ষ্মী বেকারী” থেকে লস্যি খায় সবাই।

“বড্ড গরম”— শাড়ির আঁচলে বাতাস করতে করতে বলে দুগ্গা। ঠাণ্ডা লস্যিতে চুমুক শেষ হতেই তাড়াহুড়ো শুরু করে দুই ভাই। সদ্য কামাই করা চিকন গোঁফে লাগা লস্যি মুছে কেতু বলে— “আমাদের জন্য কিন্তু কিছু কেনা হলোনা।” কেতুর কথা শুনে বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকায় দুই বোন।

“এতো দামী মোবাইলটা কে কিনলো শুনি?! সব টাকা তো তোরাই খরচ করে ফেললি”— মুখের উপর বলে দেয় সরু। “তোদের মতো গণ্ডা গণ্ডা শাড়ি কিনে টাকা নষ্ট করিনি” — কেতুর জবাব।

রাজপথে যুদ্ধ আসন্ন আশঙ্কা করে মাঝখানে ঢুকে পড়ে গণেশ। বলে— "আসলে মোবাইল জীবনের পার্ট হয়ে গেছে। এটা ছাড়া তো এখন এক কদমও এগুনো সম্ভব নয়।"

লক্ষ্মী পাশ থেকে মাথা নাড়ে। "কম্পিউটারেও একই অবস্থা। জি এস টি চালু হবার পর তো ছোট-বড় প্রতিটি দোকানেই মাস্ট হয়ে গেছে" — সরুর দিকে তাকিয়ে বলে লক্ষ্মী।

শাড়ির খোঁচায় জ্বলে উঠা আগুনটা তখনও দাউ দাউ করছিলো। "পড়াশোনা, বইপত্র ডাউনলোড, ভালো কিছু জানা ও দেখার জন্য না হয় একটু দামী অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দরকার। শুধু এফ বি, হোয়াটসঅ্যাপ, ট্যুইটারের জন্য এত পয়সা খরচের কি প্রয়োজন?"— রাগতস্বরে জানতে চায় সরু।

"আহা !! থাম থাম।"— সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করে দুগ্গা।

সরু ছাড়ার পাত্রী নয়। আঁতে ঘা লাগলে বীণার সবগুলি তার একসাথে বেজে উঠার মতো তার মাথা টনটন করে উঠে।

"ছেলে হয়ে স্নো, পাউডার মেখে ইনস্টাগ্রামে নিজের এতো হাসি হাসি ছবি দেয়ার মানে কি?"— কেতুর মুখের সামনে গিয়ে জানতে চায় সরু। "শুধু এ জন্য এমন দামী মোবাইল ?!!" — বিস্ময়ভরা চোখে সরু জিজ্ঞেস করে।

কেতুর সেন্টিমেন্ট সাংঘাতিক। একবার পুরো ব্রহ্মাণ্ড আগে কে ঘুরে আসতে পারবে এ নিয়ে চ্যালেঞ্জে দাদার বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়েছিলো। মায়ের চারদিক ঘুরে দাদা বলে তার নাকি ব্রহ্মাণ্ড ঘোরা হয়ে গেছে। এমন সর্টকার্ট পথে যেতে রাজী ছিলো না কেতু। সেদিন দাদার আচারণ সেন্টিমেন্টে বড় ধাক্কা দিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে অ্যানফিল্ড নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়ে। "ভটভট.." করে পুরো দুনিয়াটা ঘুরে তবেই বাড়ি ফিরেছিলো।

সরুর কথায় সেই সেন্টিমেন্টটা কেতুর পুরুষ প্রাণে আবার ঘা দিয়েছে। বোনের বাক্যবাণে একপ্রকার অপমান বোধ করে কেতু। ইচ্ছে করছিলো এখনই পাহাড়ে ফিরে যেতে। কিন্তু বাড়ি ফেরার টিকিট তো দশমী দিনের। তাছাড়া এফবি, ইনস্ট্রাগ্রামে পুজোর ছবি আপলোড করবে বলে বন্ধুদের কথা দিয়ে এসেছে। নিজের ছবি আপলোড করতে হলে নতুন জামা-কাপড় তো কিছু চাই। ফলে তীরের সূক্ষ্মতায় বোনকে জবাব দেয়া হলো না।

"আমি আসলে আমাদের দুই ভাইয়ের কোনো জামা-কাপড় কেনা হয়নি এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম" — সুর নামিয়ে বলে কেতু।

কেতুর নরম কথায় পরিবেশ ঠাণ্ডা হয়। আশ্বিনাকাশে পেঁজা তুলা মেঘ আবার খেলতে শুরু করে। "খ্যাচ.. খ্যাচ .." শব্দ হয় সরুর মোবাইলে। গণেশ নাক উঁচিয়ে বলে— "আবার সেলফি।"

"তোদের বাবার মোবাইল সেটটা কিসের রে ?" — জানতে চায় দুগ্গা।

"ওটা তো নোকিয়া-১১০০ মডেল। সেই মান্ধাতা আমলের" — নাক সিঁটিয়ে বলে লক্ষ্মী।

দুগ্গার মুখে করুণার ছাপ। "সে দিন তো আমার চুলের গার্ডার চেয়ে নিয়ে মোবাইলটা বাঁধলো দেখলাম" — স্বামীর প্রতি করুণা ঝরে পড়ে দুগ্গার।

দু'টি শ্বাসের শুধু অন্তর। তারপর নিজে নিজেই দুগ্গা বলে উঠে — " দরকার নেই বাবা স্মার্ট ফোনের। কালী, মনসাদের হাতেও স্মার্ট ফোন দেখে এলাম। যে যুগ পড়েছে!!"

মা'র কথা শুনে ভ্রু কুঁচকায় ছেলেমেয়েরা। মায়ের পেছন পেছন আবার পথ হাঁটতে শুরু করে সবাই। আরও অনেককিছু কেনাকাটা করে। লক্ষ্মী নিজে পছন্দ করে বাবার জন্য কিছু কাপড়-চোপড় কিনে।

"লোকটা ভালো জামা-কাপড় আর পরে কই?"—দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলে দুগ্গা। বলতে থাকে— "যাই দেবে এমনভাবে প্যাঁচিয়ে পরবে মনে হয় যেন ছাল-বাকল পরে আছে।" সরু বলে— "বাবা তো এমনই।"

এক জায়গায় বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে। মণ্ডপে মণ্ডপে যেতে হবে। আবার চলতে শুরু করে সবাই।

"আরে একটু দাঁড়া"— উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সিংহ দুয়ারে ফোয়ারার সামনে এসে চেঁচায় সরু। নিমিষেই ঘাড়টা কাত করে নেয়। আকাশের দিকে তুলে ধরে মোবাইল। মুখ হাসি হাসি। "খ্যাচ..খ্যাচ.." মোবাইল শব্দ করে উঠতেই সবার সাথে পা মেলায় সরু।

শহরজুড়ে কতো কতো পুজোর আয়োজন। বড় ক্লাবগুলির বেশিরভাগই থিমের পুজো। বেশ ভালো লাগে দুই ভাইয়ের।

ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ঝোঁক কেতুর। বাঁশ, কাঠ, কাপড় দিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে কি করে এতো বড় বড় মন্দির, প্রাসাদ তৈরি করে ফেলে তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে তার।

শহর ঘুরে ঘুরে তারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব, রামঠাকুর সংঘ, শান্তিপাড়া, নেতাজী প্লে সেন্টার, ভট্টপুকুরের মডার্ন ক্লাবসহ সব মণ্ডপ দেখে। কোনো মণ্ডপ পছন্দ হলেই সরুর

ঘাড় কাত হতে শুরু করে। লক্ষ্মীকে টেনে ধরে গালের কাছে। মোবাইলে "খ্যাঁচ..খাচ.." শব্দ হবার পরই ছাড় পায় লক্ষ্মী।

পুজোতে আগরতলায় হাঁটতে ভালো লাগছে মা ও ছেলেপুলেদের। মণ্ডপে মণ্ডপে এরমধ্যেই ঘোরা হয়ে গেছে। যেখানে গেছে চাল, কলাই খেয়েছে বেশি। "পুজোতে একটু অন্যরকম না খেলে হয়"– ভুরিতে হাত বুলিয়ে দুগ্গার দিকে চেয়ে বলে গণেশ।

"লিটেল সেফ, তাজ, খুন্তি-কড়াই, পিজারিয়া, বাবুর্চি, ফিস্ট, দি ফ্যাট চিকেন, কে এফ সি, অশোকা, অভিষেক, সরতাজ ..."— গড় গড় করে কতো রেস্টুরেন্টের নাম বলতে থাকে লক্ষ্মী।

মণ্ডপ ঘোরা বিরত রেখে ছেলেপুলে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ে দুগ্গা। চিকেন বাটার মশলা, বাটার নান, সঙ্গে জিরা রাইস, ফিস মশলা, ডাল ফ্রাই নানা কিছু খেয়ে সবচেয়ে বড় ঢেঁকুরটি তুলে গণেশই।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম শেষে কেতুর ইচ্ছা ঊষাবাজারের ভারতরত্ন সংঘের পুজোটা দেখার। প্রতি বছরই মারাত্মক ভিড় হয় সেখানে। ভারতরত্ন সংঘের পুজোর আয়োজন দেখে ভালো লাগলো সবার।

তিনজন যাত্রী তোলা হয় বলে ঊষাবাজার থেকে ফেরার পথে একটি অটোরিক্সায় দুই মেয়েকে নিয়ে বসে দুগ্গা। দুগ্গাদের অটোরিক্সাটি সোজা পথের আসার কথা ছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ আসার পর সোজা না এসে মা ও দুই মেয়েকে নিয়ে হঠাৎ অপরিচিত একটি গলির দিকে বাঁক নিয়ে অন্ধকারে দ্রুত ছুটতে থাকে অটোরিক্সাটি।

"ধর.. ধর.. পালালো.. পালালো.."— বলে চিৎকার করে বিছানা থেকে তেড়েফুড়ে উঠে মহাদেব।

চুলায় লাকড়ি ঠেসে ধোঁয়ায় চোখমুখ জ্বালা করছিলো দুগ্গার। স্বামীর চিৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

" আরও গঞ্জিকা খেয়ে ঘুমাও"— মুখ ভ্যাংচে বলে দুগ্গা।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু বুঝে উঠতে পারছিলো না মহাদেব। মাথা চুলকে বিড় বিড় করে বলতে থাকে— "তোমার পিউর সিল্ক.. লক্ষ্মীর বন্ডেজ.. সরুর মোগা সুতার শাড়ি.. কেতুর স্যামসঙ মোবাইল.. তোমাদের আগরতলায় পুজো দেখা.. রেস্টুরেন্টে চিকেন বাটার মশলা"..

"ছাইপাস খেয়ে ঘুমাও তো , তাই যখন খুশি স্বপ্ন দেখো। ঘরে ভাত খাবার চাল নেই , আর বলে কিনা চিকেন.. বাটার মশলা!! বাপের জন্মে খাইয়েছো কখনও?" —একনাগাড়ে বলতে বলতে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে দুগ্গা।

চুলার জ্বাল নিভে ধোঁয়া বেরুতে থাকে। সেই ধোঁয়ার আড়ালে দুগ্গাকে সাক্ষাৎ মহিষাসুরমর্দিনী বলে মনে হচ্ছিল মহাদেবের। হাতে খুন্তি আছে কিনা ঘুম জড়ানো চোখে দেখে নেয় মহাদেব।

"বিছানা ছাড়ো। কতো বেলা হয়েছে জানো?"— সুর চড়িয়ে বলে দুগ্গা।

পাশের ঘরে পড়ছিলো সরস্বতী। মায়ের চেঁচামেচি শুনে জানতে চায় কি হয়েছে।

দুগ্গা বলে— "তোদের বাবা স্বপ্ন দেখেছে আমাদের নাকি আগরতলায় পুজো দেখতে পাঠিয়েছে। শোন্ কথা।"

"এমা ! একি!!"— বলে বাবাকে উঁকি দিয়ে একবার দেখে আরও জোরে জোরে পড়তে থাকে সরু।

স্বামীর আহ্লাদি স্বপ্নে গা জ্বালা করছে দুগ্গার। চুলায় আরেক টুকরো কাঠ গুঁজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এসে বলে— "বারবার বলেছি আগরতলায় কতো সুন্দর সুন্দর পুজো হয়। একবার নিয়ে চলো। নিয়ে তো যায়নি, এখন স্বপ্ন দেখে আবোল-তাবোল বকছে। কতো ঢং..."

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিছানার মধ্যেই ভোলাবাবার মতো বসে আছে মহাদেব। সেই কবে আগরতলায় এক মিষ্টির দোকানে কাজ করতো। শহরটা মোটামুটি চেনা মহাদেবের। এই চেনা শহরে বৌ-বাচ্চা পুজো দেখতে গেছে বলে স্বপ্ন দেখে বেচারা।

" নেশা কেটেছে ? " — খোঁচা দুগ্গার।

ফ্যালফ্যাল করে বৌয়ের দিকে চেয়ে আছে বেচারা। ভাবছে স্বপ্ন কতই না মধুর।

"যাও.. যাও.. কাজে যাও। আমাদের টিলার সবাই রেগার কাজে চলে গেছে। নেশার ঘোরে আর স্বপ্ন দেখার কাম নাই" — ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে দুগ্গা।

"কিছু খাবার.."— স্বপ্নের মোহ ছেড়ে প্রথমবার বললো মহাদেব। উঠে চোখে-মুখে জল দেয়। দুইটা কাঁচালঙ্কা ও লবণ দিয়ে পান্তাভাত সামনে রাখে দুগ্গা। খেয়ে ঘরের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে "দুগ্গা.. দুগ্গা.."— বলে হাতদা নিয়ে কাজে বেরিয়ে যায় মহাদেব।

নারী ভাবনা

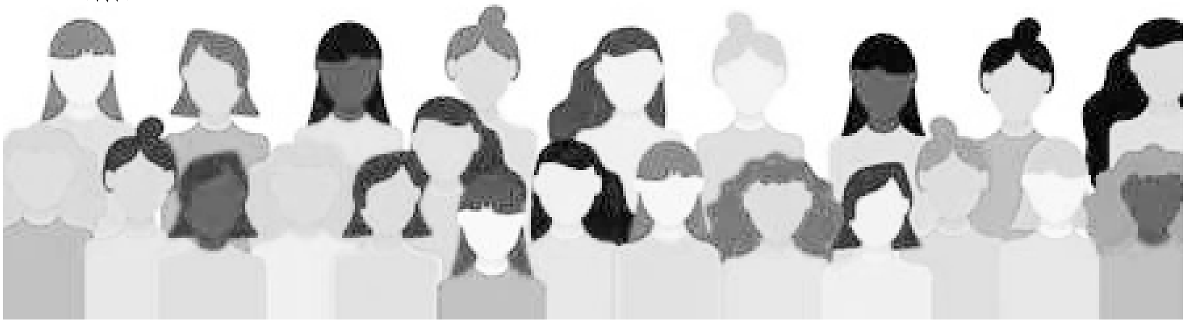

উন্নত হোক চেতনা বিকশিত হোক ভাবনা

বর্ণালী গোস্বামী
(চেয়ারপার্সন, ত্রিপুরা মহিলা কমিশন)

ভাষাজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ মানুষের বোধ শক্তিকে যতটা না অনুভূতি সম্পন্ন করে তোলে, তার থেকে অনেকটা আত্মোন্নতি করে তোলে নিজের আত্ম উপলব্ধিকে। এই ভাষা জ্ঞানই ঠিক করে কোন্টা সঠিক আর কোন্টা ভুল, কোন্টা ন্যায় আর কোন্টা অন্যায়, কোন্টা সত্য আর কোন্টা মিথ্যে। আর তাই এই ভাষা জ্ঞানের জায়গাটা থেকেই জন্ম নেয় প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদকে সঠিক সময়ে তুলে ধরার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বহুজন তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলছেন।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ এখন ইতিমূলক নয় বরঞ্চ নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সময়ের একটা অপচয় করে চলছে। পরচর্চা,পরনিন্দা ও পরনির্ভরশীলতা এই তিনে মিলেই সময় কাটে সিংহভাগ। নতুনত্বের ইতিমূলক কোনো আত্ম উপলব্ধি এদের নেই, নেই কোনো জ্ঞানের অসীম চর্চা। ফলবশত মানুষে মানুষে চলছে অবিশ্বাস, আর এই অবিশ্বাস থেকে জন্ম নিচ্ছে একটা মানুষের প্রতি আর একটা মানুষের বঞ্চিত, অপমানিত, শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হবার মত ঘটনা। মানুষে মানুষে এমন পরিণতি সামাজিক পরিকাঠামোকে এক ভয়াবহ আগামীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বহু ঘটনা সালতামামিতে নজর ঘোরালে লক্ষ্য করা যায় এই অবিশ্বাসের হাত ধরে কত শত অবক্ষয় ঘটে গেছে। তন্মধ্যে, নারীদেরকে নিয়ে এই অবক্ষয়ের কথা সর্বাগ্রে উপস্থাপন করতেই হয়। আজ এমন একটা প্রদেশ নেই যেখানে নারীদের প্রতি অবক্ষয়ের দাগহীন একটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ভোর থেকে রাত কতশত ঘটনাবহুল অবক্ষয় ঘটে চলছে তার হিসেব যতটা না সামনে আসছে, তার থেকে এমন বহু ঘটনা সামনে আসছে না—নানা প্রতিবন্ধকতার দরুন। এই প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে তদুপরি সামাজিক অবক্ষয়ের এগিয়ে থাকা নারীর কথা ফুটিয়ে তুলতে, প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে নারী নিরাপত্তায় রাজ্য মহিলা কমিশন।

নারী ভাবনার বিকাশে উন্নত চিন্তার জাগ্রতবোধে মহিলা কমিশন কাজ করে চলছে। অদম্য মনোবল আর বলিষ্ঠ চেতনায় স্বচ্ছ সমাজ গঠনে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলছে রাজ্য মহিলা কমিশন। সামাজিক অবক্ষয়ের বহু ঘটনা প্রতিবাদের ভাষা দিচ্ছে এই কমিশন। বিকশিত করছে জ্ঞানের পরিধি। মানুষে মানুষে বিভেদ, নেতিমূলক চিন্তার অবসানে কমিশন সুস্থ্য সমাজ গঠনে এগিয়ে যেমন আছে, তেমনি এগিয়ে থাকবে। নারী নিরাপত্তা ও সন্মানবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে মহিলা কমিশন আরো বহু দূর এগিয়ে যাবে। পরিশেষে শারদোৎসব উপলক্ষ্যে সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

এ বছর শারদোৎসবের মন্ডপ তৈরির আগে খুঁটি পূজা

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে ক্লাব কর্তৃপক্ষ

বিগত বছরে শারদোৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা
হাতে মডার্ণ ক্লাবের সদস্যরা

ক্লাবের অনুষ্ঠানে তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী, আগরতলা পুর নিগমের
মেয়র, ক্লাব সভাপতিসহ অন্যান্যরা

ক্লাবের উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান

ক্লাবের অনুষ্ঠানে প্রবীণদের সংবর্ধনা জানাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী

ক্লাবের বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে মেয়র, তৎকালীন বিধায়ক,
ক্লাব সভাপতি ও তৎকালীন ক্লাব সম্পাদক

লক ডাউনের সময় অসহায় মানুষের সাহায্যে খাদ্যসামগ্রী বিলির আগে

বিগত বছরে মহিলা পরিচালিত
ক্লাবের পূজা কমিটি সদস্যরা

করোনাকালে ক্লাবের সাহায্য নিতে লাইনে
দাঁড়িয়ে দুঃস্থজনেরা

ত্রিপুরা সরকার
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর

নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন পরিষেবা

১) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করা হয়।
২) মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহারের মাধ্যমে প্রতিটি গর্ভবতী মাকে ৪ (চার) কিস্তিতে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা সহায়তা দেওয়া হয়।
৩) মুখ্যমন্ত্রী অন্ত্যোদয় শ্রদ্ধাঞ্জলী যোজনায় পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুতে এককালীন ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা সুবিধা দেওয়া হয়।
৪) PMMVY এর মাধ্যমে একটি মাত্র জীবিত সন্তানের জন্য ৩ (তিন) কিস্তিতে মোট ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সুবিধা প্রদান করা হয়।
৫) পোষন মাহ/মাতৃ বন্দনা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে গর্ভবতী, প্রসুতি মা ও শিশুদের উন্নত স্বাস্থ্য গঠনে বিভিন্ন কর্মসূচী রুপায়িত হয়।
৬) ৩৩ (তেত্রিশ) টি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ভাতা প্রদান করা হয়।

বিস্তারিত জানতে নিকটবর্তী ICDS কেন্দ্র বা ICDS প্রজেক্টে যোগাযোগ করুন।

সৌজন্যে ঃ

নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারীক
ডুম্বুরনগর ICDS প্রজেক্ট, টি.টি.এ.এ.ডি.সি, ধলাই

পদ্মা সেতুর সুফল পাচ্ছে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গও

পড়শি

রফিকুল ইসলাম সবুজ

"ঢাকার সঙ্গে কলকাতার দূরত্ব যেমন কমিয়ে দিয়েছে এই পদ্মা সেতু, তেমনি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার সঙ্গেও কলকাতার সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ করে দিয়েছে।...."

পদ্মা নদী বাংলাদেশের প্রধান নদী। এক দশক আগেও প্রমত্ত ও খরস্রোতা পদ্মা নদীতে সেতু তৈরী কেবল স্বপ্নই ছিলো। বহু প্রতীক্ষিত সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে গত ২৫শে জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন হওয়ার মধ্য দিয়ে। এই নদীতে নির্মিত হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ও আলোচিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু।

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় ৪২টি পিলার, ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যানের মাধ্যমে মূল অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে। পদ্মা সেতুতে যে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে তার এক একটির ওজন এক টন। পাথর ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে আমদানি করা হয়েছে। সেতুর পাইলিং ১২২ মিটার গভীরে স্টীলের পাইল বসানো হয়েছে। এইসব পাইল তিন মিটার ব্যাসার্ধের। বিশ্বের এখনও পর্যন্ত কোনো সেতুর জন্য এত গভীরে পাইলিং হয়নি। পদ্মা বহুমুখী সেতু শুধু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নয়, পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতি বদলে দিয়েছে। তেমনি দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ, বাণিজ্য, পর্যটনসহ অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে চলেছে। ঢাকার সঙ্গে কলকাতার দূরত্ব যেমন কমিয়ে দিয়েছে এই পদ্মা সেতু, তেমনি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার সঙ্গেও কলকাতার সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ করে দিয়েছে। আগে পদ্মা সেতু ফেরি দিয়ে পার হওয়ার জন্য ৫ থেকে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত ঘাটে অপেক্ষা করতে হতো। এখন সেই পদ্মা মাত্র ৬ মিনিটে পার হওয়া সম্ভব হচ্ছে। এতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলবাসীর পাশাপাশি ভোগান্তি কমেছে কলকাতা- ঢাকা- আগরতলা রুটের বাস যাত্রীদের। কারণ পদ্মা পার হতে ফেরির জন্য তাদেরকেও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হতো।

পদ্মা সেতুর কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যে আরও উন্নত হয়েছে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। ভারত-বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

ভারত থেকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যেমন পেঁয়াজসহ অন্যান্য পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক সুবিধা হবে। আগে যাতায়াতের খরচা ছিল অনেক, তেমনি দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাতে সময় লাগতো। পদ্মা সেতুর জন্য সড়ক ও রেল পথে ভারত থেকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় অনায়াসে পৌঁছানো যাচ্ছে এবং সেটা কম খরচায় ও কম সময়ে। তাছাড়া পর্যটন শিল্পেও ভারতের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রবণতা বাড়ছে। পদ্মা সেতুর কারণে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

পদ্মা সেতুর সুফল আরও বেশি পাওয়া যাবে কালনা সেতু নামে আরেকটি সেতু চালু হওয়ার পর থেকে। কালনা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে এটি। কলকাতা ও ঢাকাকে আরও কাছে নিয়ে আসবে ফরিদপুর ও নড়াইল জেলার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মধুমতী নদীর ওপর নির্মিত এই কালনা সেতু। পরিষেবা শুরু হলে ঢাকার সঙ্গে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার হ্রাস পাবে। শুধু যাত্রী নয়, পরিবহণ খরচেও বিপুল সাশ্রয় হবে। সময়ও কমবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলবাসীর আরেকটি স্বপ্নপূরণ হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম ছয় লেনের কালনা সেতুর মধ্য দিয়ে। সেতুর মূল নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর এখন চলছে আলোর ব্যবস্থা

ও দৃষ্টিনন্দন কাজ। এক মাসের মধ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য সেতু সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা হচ্ছে। উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছেন কলকাতা-ঢাকা যাতায়াতকারীসহ বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, যশোর, বেনাপোল, সাতক্ষীরা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলার কোটি কোটি মানুষ। মুখিয়ে আছেন যাত্রীবাহী বাসসহ অন্যান্য যানবাহন সংশ্লিষ্টরা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) অর্থায়নে কালনা সেতু নির্মিত হয়েছে। কালনা সেতু চালু না হওয়ায় কলকাতা-ঢাকা, আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতা ভ্রমণকারীসহ দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলার লোকজন পদ্মা সেতুর সরাসরি সুফলও পাচ্ছেন না। কারণ, কালনাঘাটে এসে ফেরি পারাপারের বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে সব ধরনের যানবাহনকে। ফেরি পার এড়াতে বহু বাস ও অন্যান্য যানবাহন ফরিদপুর, মাগুরা এবং গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা ঘুরে কলকাতায় যেতে হচ্ছে। এজন্য সবাই এখন কালনা সেতু উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছেন। জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে সম্মতি পেলে এক মাসের মধ্যেই যানবাহন চালাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে সেতুটি।

সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬৯০ মিটার ও প্রস্থ ২৭ দশমিক ১ মিটার। দুই পাশে ছয় লেনের সংযোগ সড়ক প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার। সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় প্রায় ৯৬০ কোটি টাকা। এশিয়ান হাইওয়ের ওপর অবস্থিত এটি। একটি কথা বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে কালনা সেতু চালু হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে। ভারতের কলকাতা ও অসমসহ বাংলাদেশের সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর, বেনাপোল-পেট্রাপোল ও নোয়াপাড়া নদীবন্দরের মধ্যে যোগাযোগের মাইলফলক রচিত হবে। সুবিধা পাবেন ত্রিপুরার লোকজনও যারা সড়ক পথে ঢাকা হয়ে কলকাতা যাবেন।

পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের স্বপ্ন, সাহস ও সক্ষমতার প্রতীক। তেমনি পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের অহংকারের প্রতীক। কারণ এই পদ্মা সেতু নির্মাণে ঋণ দেওয়ার কথা ছিল বিশ্বব্যাংকের। তারা পদ্মা সেতু নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ঋণ বন্ধ করে দিতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন বাংলাদেশ কোন ঋণ না নিয়ে নিজের অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করবে এবং তা করে দেখিয়েছেন।

ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। ছয় লেনের এই ৫৫ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ের আদলে এবার ভাঙ্গা থেকে যশোরের বেনাপোল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে। ১২৯ কিলোমিটারের এ সড়কটিও হবে ছয় লেন বিশিষ্ট। এজন্য প্রাথমিকভাবে ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ১১ হাজার ৭২ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ভাঙ্গা-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক এশিয়ান হাইওয়ে-১ এর অংশ। সড়কটির বেনাপোল প্রান্তের অন্য পাশে ভারতের পেট্রোপোল অবস্থিত। ভারত থেকে প্রায় ৯০ শতাংশ পণ্য বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি হয়। এছাড়া সড়কটি মোংলা পোর্টে যাতায়াতেও ব্যবহৃত হয়। ১২৯ দশমিক ১৭ কিলোমিটার সড়কটি ছয় লেনে নির্মিত হলে বছরে বেনাপোল হয়ে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) মো. জাকির হোসেন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আশা করা হচ্ছে ভারত এ প্রকল্পে অর্থায়ন করবে। এছাড়া এডিবিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীও খোঁজা হচ্ছে। পদ্মা সেতুর আরও সুফল পেতে হলে এই সড়কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন তিনি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বেনাপোল হয়ে কলকাতা ও ঢাকার সঙ্গে যাতায়াতের সময় কমে আসবে। একইভাবে ত্রিপুরার সঙ্গেও ঢাকা হয়ে কলকাতার যাতায়াত সময় কমবে। পদ্মা সেতু চালুর মধ্য দিয়ে ঢাকা- বেনাপোলের দূরত্ব কমেছে ৯৩ কিলোমিটার। এতে সময় বাঁচছে প্রায় চার ঘণ্টা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা থেকে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া হয়ে বেনাপোলের দূরত্ব ২৭৮ কিলোমিটার। এই পথে ঢাকা থেকে বেনাপোল যেতে সময় লাগতো আট থেকে নয় ঘণ্টা। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় বর্তমানে মাওয়া দিয়ে বেনাপোলের দূরত্ব হয়েছে ১৮৫ কিলোমিটার। যেতে সময় লাগছে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। ফলে এই পথ দিয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হয়েছে।

(লেখক: ঢাকার 'দৈনিক সময়ের আলো'র বিশেষ প্রতিনিধি ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পি আই বি) পরিচালন বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য)

সাবধান!

পানীয় নয়, এটা বিষ

শ্রাবন্তী রায়চৌধুরী

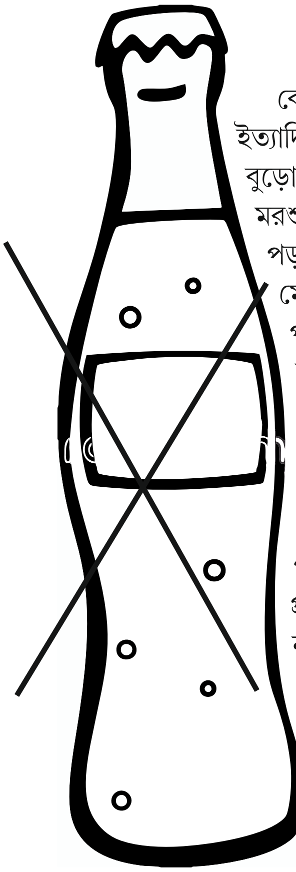

কোকাকোলা, পেপসি, ফ্রুটি, মাজা ইত্যাদি সব নরম পানীয় বাচ্চা থেকে বুড়ো আমরা সবাই পান করি। উৎসবের মরশুমে তা যে আরও বেশি করে গলায় পড়বে—তা বলাই বাহুল্য। আমরা মোটামুটি সবাই জানি এই নরম পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো না। তবু ফ্রিজ থেকে নামিয়ে কয়েক ঢোঁক না গিললেই যেন নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে এর ক্ষতিকর দিকটা আমরা জানি না বলেই, ভাবি একটু খেয়ে ফেলি। এরপর চলে ঢোঁকের পর ঢোঁক। অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায় প্রায় প্রতিদিন। আসুন এই ঠাণ্ডা নরম পানীয়র একটা কম চর্চিত ক্ষতিকর দিক জেনে নিই।

চিনির নেশা : এ ধরনের নরম পানীয়তে থাকে ভরপুর চিনি আর সোডা জল। কোনোরকম খাদ্যগুণ থাকে না। চিনি এতটাই বেশি থাকে যা আমাদের শরীরের সহ্যক্ষমতার অনেক উপরে। দীর্ঘদিন এই পানীয় খেলে কিডনি, প্যানক্রিয়াস ও হার্ট কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আমরা অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাই ও ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হই।

সবথেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো এই চিনি ও সোডার জল আমাদের নেশাগ্রস্ত করে তুলে। ফলে আমরা হয় নিয়মিত নরম পানীয় পান করতে থাকি অথবা চিনিতে ভরপুর অন্য খাদ্য, যেমন— মিষ্টি, আইসক্রিম ইত্যাদি নিয়মিত না খেয়ে থাকতে পারি না। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর পেপসিকো ১৯৬৪ সাল থেকে এবং কোকাকোলা ১৯৮২ সাল থেকে ডায়েট পেপসি বা ডায়েট কোক চালু করে। যা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের আরেকটা ফন্দি। মনে রাখতে হবে সব নরম পানীয়তেই কৃত্রিম চিনি দেওয়া হয়। ফলে ক্ষতির মাত্রাও একই থেকে যায়। বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে কৃত্রিম চিনি ক্যান্সারেরও কারণ। এছাড়াও রঙ আকর্ষণীয় করার জন্য ক্যারামেল যোগ করা হয়। এটি আসলে পুড়ে যাওয়া চিনি। এই পুড়ে যাওয়া চিনি খেলেও একই ক্ষতি। অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ দ্বিগুণ।

তাহলে বন্ধুরা এই ক্ষতিকর নেশা থেকে বাঁচতে এবং নীজের জীবনকে সুস্থ-সুন্দর রাখতে নরম পানীয় থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। এই পুজোর সময় থেকেই শুরু হোক গলা ভেজানোর নামে মারন রোগ ডেকে আনা নেশার বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ।

মানুষের ক্ষেত্রে চিনির প্রয়োজন শূন্য।
প্রতিদিন মানুষের সহ্যক্ষমতা পুরুষ - ৩৬ গ্রাম ও মহিলাদের - ২৫ গ্রাম।
নরম পানীয় বোতলে (৫০০ মিলি) গায়ে লেখা চিনির পরিমাণ হচ্ছে ৮২ গ্রাম।
(অতএব সমস্ত নরম পানীয় কোম্পানী পরোক্ষে স্বীকার করছে যে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর জিনিসের ব্যবসা করছে।)

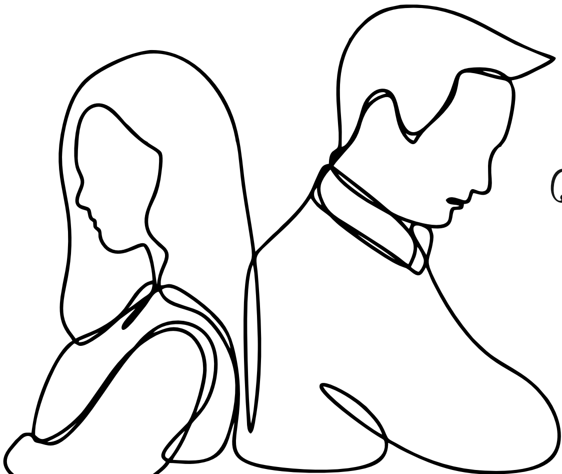

কবিতা

কোশবিভাজন ও প্রেমিক

দিপ্সি দে

ভীষণ অসুস্থ। মস্তিষ্কের কাজ থেমে গেছে প্রায়,
বোধহয়! স্নায়ুকোশগুলি বিভাজিত হয় না আর,
নিউক্লিয়াসের গোল অংশটি যে অংশটি সূত্রাকার নিচের দিকে নেমে গেছে সেখানে প্রেমিকটি রেখে গেছে অজস্র কবিতা।
একটি আস্ত চারাগাছ। রোটেশানে ধরা দেয় প্রেম, ধুকবুক বেড়ে যায়। শ্বাস ক্রমশ জটিল হয়, নিউক্লিয়াস মরে যায়।
অবশেষে শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয় প্রেমিকের চোখের জল।
ধমনি ও হৃদপিন্ড সাক্ষ্য বহন করে প্রেমিকের ছুঁয়ে যাওয়া চিঁবুক।
সমস্ত কোশগুলি বিভাজিত হতে হতে জন্ম দেয় একটি নিথর দেহের কবিতা।
কবিতাটি আজও কবিটিকে খোঁজে একটি অশালীন সন্ধ্যায়।
মুখোমুখি হতে চায় মিয়োসিস।

ভার্চুয়ালের ডাক

মৌসুমী কর

ভার্চুয়ালের ডাক
মুখ ফেরানো দায়
সময় চায়
আপডেট আর আপডেট...
সব সাইটেই আজ
অস্তিত্বের লড়াই।
অস্তিত্বটাই আজ অনস্ক্রিনে
অথবা অফস্ক্রিনে ....
জীবন আর স্ক্রিন
মিলেমিশে একাকার।
শরতের কাছে আজ
প্রত্যাশা তেমন নেই
আকাশে বাতাসে তাই
শরতের উপচে পড়া অভিমান।

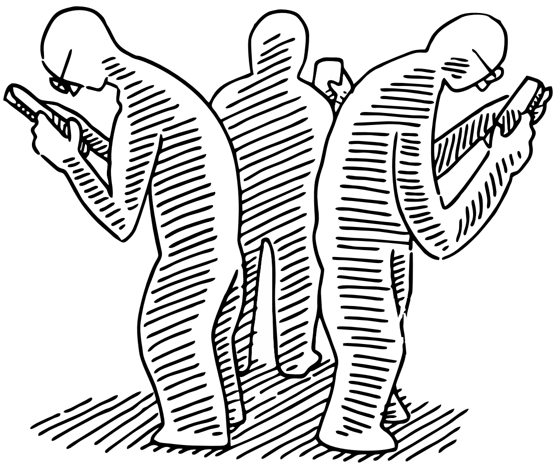

কিছু কথা

সংহিতা ভট্টাচার্য

কিছু কথা ঢেলে দেয় বিষ
অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায় অহর্নিশ।

কিছু কথা ধরায় জ্বালা
যুক্তিহীন, কান ঝালাপালা।

কিছু কথায় ঝরে দম্ভ আর অহং
চিনিয়ে দেয় জীবনের নানা রঙ।

কিছু কথা শেখায় জীবন সংগ্রাম
আবেগ ভুলে ছুটে চলা অবিরাম।

কিছু কথা ছুঁয়ে থাকে মন সারাক্ষণ
রামধনু রঙে আকাশ সাজে যেমন।

কিছু কথার পরশে জুড়ায় বুক
সাজে কতো স্বপ্ন, খুঁজে পাই সুখ।

কিছু কথা থাকে শাড়ির ভাঁজে
উদাসী দুপুরে ক্লান্ত বীণায় বাজে।

কিছু কথা দেখায় আলোর পথ
হতাশা ভুলে করি বাঁচার শপথ।

নানা কথায় জড়িয়ে ক্ষয়িষ্ণু এই জীবন.....
কথা দিয়ে শুরু কথাতেই সমাপন।

দিনের পর রাত

নিয়তি দাস

জীবনের বেপরোয়া গতি
হৃদয় তরঙ্গে জেগে আছে পৃথিবী—
চারপাশে রাশি রাশি আলো
সাদা ভাতের মতো উজ্জ্বল
আমার চেতনার মতো চঞ্চল,
জ্যোৎস্নায় শরীর ডুবিয়ে
চাঁদ ভাঙ্গে আঁধার
আমরা ভাঙ্গি সমাজ সভ্যতা-আবার গড়িও
দূরে কাছে হৃদয়ের আবেগ নিয়েই - পৃথিবী উত্তপ্ত
এখানে যে যেরকমই থাকুক না কেন?
আমি স্বপ্নের ঘোরে জেগে থাকি

কাশফুল

মনচলি চক্রবর্তী

শরতের নীল আকাশে বাতাসে , দেবী দুর্গার
আগমনীর মধুর সুর বাজে।
কাশফুলের বনে বনে শরতের রানী নতুন রূপে সাজে।
বর্ষা শেষে কালো মেঘ সব মুছে শরৎ এলো
কাশ ফুলের গায়ে নতুন রঙের পরশ মাখালো।
মায়াবী শরতের সোনালী রোদের ইন্দ্রজালেতে
কাশের দল হেসে ওঠে খুশীর দোলায় নদীর তীরেতে।
কাশফুল বয়ে নিয়ে আসে
মায়ের আগমনীর বার্তা ধরাধামে,
শরৎকালে দেবী পার্বতীর আরাধনাতে
ধরনী নেচে উঠে কাশফুলের দোলাতে।

গল্প

'কিক্ কিকিউ, কিক্ কিকিউ'

অরিন্দম নাথ

> "জাদুকর পরবর্তী খেলার দিকে এগিয়ে গেলেন। আরেকটি গ্লাসে জল নিলেন। মন্ত্র পড়লেন। এবার বাজ পাখিটিকে বাক্সে রাখলেন। তারপর মন্ত্রপূত জল বাজ পাখির গায়ে ছিটালেন । এক নিগ্রো মহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি নিজেই পরিচয় দিলেন—আমি কবি মায়া অ্যাঞ্জেলু।..."

সুদৃশ্য একটি হলঘর । মোটামুটি ভর্তি । সামাজিক দূরত্ব মানতে গিয়ে মধ্যে একেকটি চেয়ার খালি রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য দর্শকরা সবাই মুখোশ পরে আছে। আমি দর্শকাসনে। প্রথম সারিতে বসে আছি। প্রেক্ষাগৃহের দরোজা জানালা খোলা। সময় দিনের বেলা। মঞ্চের স্থানটিতে কিছু আলো-আঁধারির সৃষ্টি করা হয়েছে। কখনও মনে হয় টেলিস্কোপিক ভীশন। কখনও বাইনোকুলার। থ্রি-ডি ভীশনও হতে পারে। ভানুমতীর খেলা চলছে। জাদুকর এবং তাঁর সহযোগীরা মুখোশ পরে আছেন । মুখোশে একটু বিশেষত্ব আছে । ঠোঁটের কাছটায় গাঢ় কমলা-হলুদ রং। জাদুকরের আলখাল্লাতেও বৈচিত্র্য । গাঢ় বাদামি রঙের কাপড়ের তৈরি ।টুপিটায় একটি ঝুঁটি রয়েছে। যেন ভাত শালিক ।আবহে লঘু সঙ্গীত ।

"এসো প্রিয়, মন রাঙায়ে ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙায়ে
মন মাধবী বন দুলায়ে, দুলায়ে, দুলায়ে ।"

জাদুকর ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া দিয়ে শুরু করেন । একটি কুঁজো উপুড় করে বালতিতে জল ঢালেন । জল গড়ানো শেষ হলে একটি ট্রের মধ্যে রেখে দেন। আবার কিছু পরে কুঁজো উপুড় করে বালতিতে জল ঢালেন। আবারও কিছুটা জল গড়িয়ে পড়ে । ম্যাজিকটি আমার কিছুটা আইডিয়া আছে ।আমার ধারণা কুঁজোর গায়ে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। জলের মধ্যে পিংপং বল জাতীয় কিছু একটা ভাসে। কুঁজো উল্টালে গলায় আটকে যায়। জলের ফ্লো কমে যায়। ছিদ্রে আঙ্গুল দিয়ে ঢেকে রাখলে বায়ুচাপের অভাবে জল গড়ায় না।আবহ সঙ্গীত বাজতে থাকে।

জাদুকর এবার তাঁর টুপিকে উল্টো করে হাতে নেন। সবাইকে দেখান ভেতরটা খালি। তারপর ঠিক তাঁর পেটের কাছটিতে মাটির সমান্তরালে বাঁ-হাত দিয়ে ধরেন। টুপির একটি পাশ তাঁর আলখাল্লাতে ঠেকানো থাকে। টুপি থেকে বিভিন্ন সামগ্রী বেরুতে থাকে। প্রথমে টেবিল ঘড়ি, প্লাস্টিকের ফুল, টেডি বিয়ার ইত্যাদি নির্জীব বস্তু। জাদুকরের সহায়ক দুইজন সুন্দরী মেয়ে। তারা সুর্মাপরা চোখে বিড়াল পদচারণায় জিনিসগুলিকে স্টেজের একপাশে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে। সবাই তাদের চলার ভঙ্গী এবং ভুরুর চাহনি ভীষণ উপভোগ করে । এবার বেরুলো একটি জ্যান্ত ইঁদুর। একজন সহকারিণী পেল্লায় লাফ মারল। দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। এই হাসির রেশ মিলাতে মিলাতেই টুপি থেকে একটি বেড়াল বেরুল । আর বেরিয়েই ইঁদুরের পেছনে ছুটল। একদম দর্শকদের মধ্য দিয়ে গিয়ে দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর বেরুলো একটি কোকিল বা পাপিয়া। আমি আগে জাদুকরের থলে থেকে পায়রা বেরুতে দেখেছি। কোকিল বেরুতে এই প্রথম দেখলাম । সবশেষে পরপর বেরুলো একটি শালিক ও একটি বাজ পাখি । অবাক হয়ে দেখলাম পাখি দুটো শান্ত হয়ে একটি লাঠির উপর বসেছে । লাঠিটি দুইপাশে দড়ি বেঁধে ঝুলানো ছিল ।আগে লক্ষ্য করিনি ।

"শোন 'পিউ পিউ' ডাকে পাপিয়া
মোরে সেই সুরে ডাক 'পিয়া, পিয়া'
তব আদর-পরশ বুলায়ে, বুলায়ে, বুলায়ে ।"

এবার জাদুকর এক বিস্ময়কর খেলা দেখালেন। সত্যি কথা বলতে কি এইজন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। জাদুকরের কথায় একজন সহকারী শালিকটিকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। জাদুকর ওয়াটার অফ ইন্ডিয়ার কুঁজো থেকে একটি গ্লাসে কিছু জল নিলেন । মন্ত্র পড়লেন। শালিকটিকে বাক্সে রেখে জাদুকর মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন। ভোজবাজির মত শালিক মিলিয়ে গেল। সুবেশী এক সুন্দরী রমণী বেরিয়ে এলেন। মহিলা জাদুকরকে আলিঙ্গন করলেন। জাদুকর এবার তার পরিচয় দিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী। আমি একটি গ্রামে থাকতাম। আমার

বাবা-মা ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। দাদির কাছে মানুষ। সারাদিন বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াতাম। একদিন এক গুরু পেয়ে গেলাম। তিনিই আমাকে ভানুমতীর খেল শেখান। আমি বিড়াল, কুকুর, পাখি বিভিন্ন প্রাণীর রূপ নিতে পারতাম। এই মেয়েটি গরিব। মা মরা। সে এক দূরের গ্রামে থাকত। গ্রামবাসীরা একদিন আমাদের বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ের পর আমি ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দিলাম। শরীরের উপর দিয়ে ভীষণ ধকল যায়। তখন অবধি বৌ কখনও আমার জাদু দেখেনি। সে রোজ রোজ বায়না করত জাদুর খেলা দেখার। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে মান-অভিমান হতো। একদিন আমি রাজি হয়ে গেলাম । তাকে বললাম দু'টি গ্লাসে জল নিয়ে আসতে । আলাদা আলাদা মন্ত্র পড়লাম । একটি গ্লাসে মানুষ থেকে পাখিতে রূপান্তরের মন্ত্রপূত জল । অন্যটিতে পাখি থেকে পুনরায় মানুষ রূপে ফিরে আসার জল । আজ যেটা আপনারা চাক্ষুষ করলেন । এরপর বৌকে বললাম, আমি পাখির রূপ নিচ্ছি । তুমি অন্য গ্লাসের মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে আমাকে আবার মানুষ বানিয়ে নিও। এই বলে আমি মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে পাখি হলাম । শালিক পাখি । বৌ অবাক হয়ে হাততালি দিতে লাগল । আনন্দের আতিশয্যে তার পায়ে লেগে মানুষে রূপান্তরের জলের গ্লাসটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল । যখন সম্বিৎ হল কাঁদতে থাকলো । শেষে বাকি গ্লাস থেকে জল ছিটিয়ে নিজেও শালিকের রূপ নিল । সে মানুষ হিসেবে থেকে যেতে পারত । কিন্তু শালিক হওয়াই পছন্দ করে। প্রকৃত প্রেমী ।

"যদি আন কাজে ভুলে রহি
চলে যেও না হে মোর বিরহী
দিও প্রিয়, কাজ ভুলায়ে, ভুলায়ে, ভুলায়ে ।"

বৌটির মধ্যে এবার কিছু শরমের আভাস । জাদুকর পরবর্তী খেলার দিকে এগিয়ে গেলেন। আরেকটি গ্লাসে জল নিলেন। মন্ত্র পড়লেন। এবার বাজ পাখিটিকে বাক্সে রাখলেন। তারপর মন্ত্রপূত জল বাজ পাখির গায়ে ছিটালেন । এক নিগ্রো মহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি নিজেই পরিচয় দিলেন, "আমি কবি মায়া অ্যাঞ্জেলু। আমার জন্মনাম মার্গারিট অ্যানি জনসন। যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের সেইন্ট লুইতে আমার জন্ম । ছোটবেলা থেকে আমার কষ্টের জীবন। বেঁচে থাকার জন্য আমি যৌনকর্মী থেকে নাইট ক্লাবের নৃত্যশিল্পী অনেক ভূমিকায় কাজ করেছি। বাস কন্ডাক্টরের কাজ করেছি। মার্টিন লুথার কিংয়ের সঙ্গে কালো মানুষের জন্য লড়াই করেছি। জন এফ কেনেডির অভিষেকে উপস্থিত থেকেছি। বিল ক্লিনটনের প্রথম অভিষেকেও আমন্ত্রিত ছিলাম। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করেছেন। আমার সাত খণ্ড আত্মজীবনীর প্রথমটির নাম 'আমি জানি খাঁচার পাখি কেন গান গায়'।

সবাই একযোগে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে কবি মায়া অ্যাঞ্জেলুকে সম্মান জানায়। তিনি একটি চেয়ারে বসেন। আমি তাঁর বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করি। এরপর থট রিডিং এর খেলা শুরু হয়। জাদুকর দর্শকদের মনের কথা বলতে পারেন। একে একে দুই-তিনজন দর্শক মঞ্চে এগিয়ে গেলেন। সবাই তাঁর ভাবনা সংক্ষেপে একটি করে কাগজে লিখে রাখল । জাদুকর একে একে বলে দিলেন। সবাই বললো, একদম সঠিক। হল আবারও হাত তালিতে ভরে উঠলো। তিনি হঠাৎ আমায় মঞ্চে ডাকলেন। তারপর বললেন, আমি জানি একটু আগে আপনি কি ভাবছিলেন। আমি কিছু বলার বা লিখার আগেই তিনি বলতে থাকলেন। গতকাল প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে আপনারা বাড়ির কাছে একটি জায়গায় ইলেকট্রিক তারের উপর বসে শতাধিক শালিককে কিচির মিচির করতে দেখেছেন। আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে শালিকের এই জমায়েতের কারণ কি?

— ঠিক তাই!

— আপনি নিশ্চয় ভালো করে লক্ষ্য করেছেন। শালিকরা 'কিক্ কিকিউ কিক্ কিকিউ' করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এটা আসলে, 'দলে দলে আস', 'দলে দলে আস' বলে ডাকাডাকি। তিন-চারদিন ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। সবার সাথে কথা বলে আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস নিশ্চিত করা হচ্ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু আসার ঠিক আগে শালিকরা ডাকে 'পিকিউ! পিকিউ!' কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ড। কখনও এক নাগাড়ে। তারপর দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড চুপ করে থাকে। এই ডাক চলে বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির আট থেকে ছত্রিশ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত। অন্য সময় ডাকবে, চিড়িক! চিড়িক! তবে দল বেঁধে ঝগড়াঝাঁটির সময় ডাকের কোনও গ্রামার থাকে না।

কবি মায়া অ্যাঞ্জেলুর কথা আমার মনে আসে । আমি জাদুকরকে বলতে যাই, "এটা কি করে সম্ভব ? মায়া অ্যাঞ্জেলু কিছুদিন আগে ৮৬ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন!"

হঠাৎ ভোজবাজির মত সবকিছু মিলিয়ে যায় । আমি বুঝতে পারি, এতক্ষণ আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখছিলাম।

গল্প

মাতৃত্ব

মঞ্জুশ্রী বর্ধন

"অ্যাই ধুর" শুনে চোখ ফেরাতেই রিমাকে লক্ষ্য করে বাক্যবাণ ছুটে এল, "এক্ষুণি হোঁচট খাচ্ছিলাম, এটার যন্ত্রণায় অসহ্য লাগে"। ভোলা তখন দরজা ছেড়ে রিমার চেয়ারের নীচে। পিঠের ক্ষত চাটছে আর রিমার গা ঘেঁসে বসার উদ্যোগ নিচ্ছে। ঘরের বাসিন্দাদের অপছন্দ বুঝতে পেরে, রিমা নিজেই চেয়ার ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। অফিসের উলটো দিকের দোকান থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে খুলে দেয় ওকে। লালায় আর কৃতজ্ঞতায় মাখামাখি মুখে গোগ্রাসে গিলছে তখন ভোলা।

ব্লক অফিসের পঞ্চায়েত সেকশনে নবাগতা নন্দিনী রায়। চটপটে, টানটান তৎপর নিজের কাজে। আবেগের কোনো ঠাঁই ওর কাছে আছে বলে গত ছ'মাসে রিমার একটুও মনে হয়নি। দরজার কাছটিতে ভোলার বসে থাকা অসহ্য তাঁর। এই ভোলার সঙ্গে রিমার ভাব ঘোষবাবুর বদলির পর। তাঁর যাবার পর অনাথ ভোলা বেশ কিছুদিন নিপাত্তা ছিল। হঠাৎ একদিন এসে হাজির। তখন করোনা তুঙ্গে, ক্যান্টিন বন্ধ। দুপুরের খাবার নিয়ে আসে সবাই। ভোলার কণ্ঠা বের করা শুকিয়ে যাওয়া শরীর। নিজের খাবার থেকে কিছুটা সঙ্গে এঁটোকাঁটা দিয়ে অন্যদের থেকেও চেয়ে নিয়ে ভোলাকে দিতে থাকে রিমা। এক নন্দিনীকে ছাড়া। সে ওই ঘিমঘিনে নেড়িকে একটুও যে প্রশ্রয় দেবে না, সেটা তার হাবভাবেই পরিষ্কার। পিতৃহীন শৈশবোত্তর কঠিন জীবন সংগ্রাম তাঁকে এই কাঠিন্য এনে দিয়েছে বলে রিমার ধারণা।

এর মধ্যেই একদিন ফেসবুক খুলে রিমা আবিষ্কার করে, নন্দিনীর চতুর্থ বিবাহ বার্ষিকীর উদ্‌যাপন, মনে মনে মুচকি হাসে সে। ওই মেয়ে বরকে সোহাগ করে তবে? ওর মনে পড়ে সংস্কৃত ক্লাসে শোনা একটি শ্লোক —

"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে

নীরস তরুবর পুরত ভাগে"

নন্দিনী তবে অফিসে প্রথমে শ্লোকানুসারি আর ব্যক্তিগত পরিসরে দ্বিতীয়!

করোনাকালীন ব্যবস্থায় ফিফটি ফিফটি কর্মী নিয়ে অফিস কাছারি চলছে। রিমা আর নন্দিনী একই গ্রুপের। একদিন ছুটির পর বেরোতে বেরোতে নন্দিনী রিমাকে জানায়, কাল থেকে আর আসছে না সে। দু'মাসের ছুটি নিয়েছে, প্রয়োজনে আরো বাড়াবে। ডাক্তারের নির্দেশে কনসেপশনের প্রথম মাস থেকেই বেড রেস্ট। আগের দু-দুটো মিসক্যারেজের পর আর রিস্ক নেওয়া যায় না। রিমা মনে মনে কপালে হাত ঠেকায়। মেয়েটাকে ভগবান যেন মাতৃত্বের সুখ দেয়। আহা, পরপর দু'বার বড্ড ভুগেছে। অফিসের চার মহিলা কর্মীর মধ্যে নন্দিনী বয়সে সবার ছোটো। বাকিরা সবাই সংসারের মাঝ গগনে। ওদের মুখে মাঝেমধ্যেই ঘুরেফিরে আসে নন্দিনীর কথা। গত মাসখানেকের মধ্যে একবারই শুধু ফোনে কথা হয়েছে। জানিয়েছে ভালো আছে। বারবার ফোনও করা যায় না, এমনই এক অলিখিত দূরত্ব বজায় রাখে সেই মেয়ে। তবুও রিমাকে কেন এত টানে সে, কে জানে।

এরই মধ্যে এক সন্ধ্যায় রিমার ফোনে বেজে ওঠে নন্দিনীর নম্বর। "আরে নন্দিনী, কেমন আছ"? উচ্ছ্বসিত রিমার প্রশ্নের জবাবে সে শুধু বলে, "আমি কাল থেকে অফিসে আসছি দিদি।" ফোন নামিয়ে রেখে শুকনো মুখে রিমা বসে থাকে কতক্ষণ। পরদিন থেকে সে অফিসে আসে। মুখেচোখে আগের কেজোভাব। কেউ ওকে সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। কঠিন মেয়েটা যে অনেকটাই নরম হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারে ওদের নারীমন।

মার্চ মাস। কাজের তাড়ায় আবার সবাই ডুবে গেল। ওদের সেকশনে ইঁদুরের এত বাড়বাড়ন্ত যে, দুটো কাঠের আলমারি ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। বড়োবাবু পান চিবুতে চিবুতে বললেন, "এবার আনা হয়েছে স্টিলের আলমারি, কাঠেরগুলো স্টোর রুমে চালান হবে।" পুরনো আলমারিগুলো ঝাড়াই চলছে। ইঁদুরের সংসার ছত্রখান হয়ে মেঝেতে পড়ল ছেঁড়াকাটা কাগজপত্র সমেত, সঙ্গে টালটাল ঘুণের গুঁড়ো। সেদিন অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ায় ঠিক হল, পরদিন বাকিটা পরিষ্কার করা হবে। বেরোবার মুখে নন্দিনীর ডাক, "দিদি দেখুন"। বাতিল টালের উপর তিন-চারটি ইঁদুরছানা— কচি তুলতুলে। রিমা দেখল, নন্দিনী করুণ চোখে তাকিয়ে। কী করবে বুঝতে পারছে না। তবে জোর ঝটকা পেল রিমা, যখন দেখল নন্দিনী সেগুলোকে তুলে আবার পুরনো আলমারির কোণায় চালান করে দিতে দিতে বলল, "থাক এখানেই, ওদের মা খুঁজে পাবে না নীচে পড়ে থাকলে।" হতবাক রিমা চেয়ে দেখে এক অপার মাতৃসত্তাকে।

লোভে পা না

সাবধান!

সঞ্জয় দত্ত

অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়েছিল মূলত ১৯৯৮ সাল থেকে। দুই দশক পেরিয়ে গেছে কিন্তু এখনো আমরা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে হ্যাকারদের দৌরাত্ম্য উপলব্ধি করি এবং তাদের বিভিন্ন রকম ছল-চাতুরীর দ্বারা সাধারণ গ্রাহকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। ইদানীংকালে আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করছি Fraud Star- রা ফোন কলে বা ম্যাসেজ ইনবক্সের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভ্রান্তিতে ফেলার কৌশল অবলম্বন করে সব টাকা-পয়সা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে অপরাধের Modus Operandi - গুলি হল যেকোনো প্রকারে গ্রাহকদের প্রলোভনে ফেলে তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে যাওয়া।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি অন্যতম সংযোজন হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার কম্পিউটার ও তার প্রযুক্তির প্রয়োগ। ভারতবর্ষে কম্পিউটার তার যাত্রা শুরু করে নব্বইয়ের দশকে। প্রথমেই বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো কম্পিউটারে কাজ শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে অফিস, আদালত, বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং ক্রমে বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মূলত একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যেমন ২০০৪-০৫ সাল থেকে ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় Any Where Banking তথা Core Banking শব্দটার সঙ্গে ব্যাঙ্কের আধিকারিক, কর্মচারী এবং অবশ্যই গ্রাহকরা ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছে ও কম্পিউটার পরিচালিত এই Core Banking ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে আসছে। প্রথমদিকে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং পরিষেবা গ্রহণকারী গ্রাহকেরা একটু সমস্যার সম্মুখীন হলেও বর্তমান সময়ে দেশের প্রতিটা গ্রাহক সেটা প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষই হোন আর শহর বা মেট্রো শহরের মানুষ, সবাই আজ এই প্রযুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন বা পারছেন।

কিন্তু ইদানীংকালে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত সব রকমের গ্রাহকরাই কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারিক কুফলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কষ্টার্জিত উপার্জন হারিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। কেন হচ্ছেন, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়-ই বা কী? এই বিষয়ে কিছু তথ্যমূলক বক্তব্য তুলে ধরার জন্যই আপনাদের কাছে কিছু আলোচনা রাখছি এই লেখায়।

কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমরা একদিকে যেমন তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছি পাশাপাশি তার অপপ্রয়োগের ফলে বা মানুষের ক্ষণিকের ভুলে অনেক ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা জানি একটি দেশের উন্নতির সোপান রচিত হয় অর্থনীতির ভিত্তির উপর নির্ভর করে। আর এই

ঘটনা প্রবাহগুলি এরকম— প্রায়শই দেখা যায় গ্রাহকদের মোবাইল ফোনে ফোন আসে যে তাদের একাউন্টে KYC আপডেট নেই, ATM expired হয়ে গেছে। Credit Card এর KYC আপডেট করতে হবে। আপনি এই কোম্পানি থেকে Gift পেয়েছেন, তাই আপনাকে একটি Link পাঠানো হচ্ছে। আপনি সেটাতে Click করুন। যে মাত্র আপনি link-এ সংযুক্ত হলেন তখন খুব সুন্দর কথায় আপনাকে প্রলোভনে ফেলে আপনার ATM এর যাবতীয় Secret data নিয়ে নিচ্ছে। আপনার Electric Bill Payment হয়নি। রাত ন'টায় কারেন্ট চলে যাবে তাই নীচের ফোন নম্বরে ফোন করুন। আপনি লাখ টাকা লটারি জিতেছেন। তাই আপনার মোবাইলে একটি ম্যাসেজ গেছে সেটাতে Click করুন, ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় True Caller-এও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নাম উঠে আসে। তাতে গ্রাহকেরাও বিশ্বাস করে ফোনে সব কিছু শেয়ার করে দেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে True Caller- এ যখন নাম ও ঠিকানা দিয়ে নথিভুক্ত করা হয় তখন Fraud Star তথা হ্যাকাররা তাদের সত্যিকারের নাম/ঠিকানা না দিয়ে ব্যাঙ্কের নাম দিয়ে Register করে থাকে। সেই বিষয়েও গ্রাহকদের সতর্ক হতে হবে।

এছাড়া মানুষ যখন তার ATM Card ব্যবহার করে কোনো প্রকার লেনদেন করেন POS Machine এর মাধ্যমে, তখন Card এর CVV নাম্বারটিও শেয়ার হয়ে

যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ATM Machine-এ ক্লোনিং করেও হ্যাকাররা গ্রাহকদের একাউন্ট থেকে অনেক টাকা নিয়ে যায় (যা বর্তমানে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে বন্ধ হয়েছে)।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যখন থেকে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে তথা Any Where Banking বা Core Banking ব্যবস্থা শুরু হয়েছে তখন থেকেই ধরে নিতে হবে ব্যাঙ্কের এবং গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য দু'তরফেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যাঙ্কিং শিল্পে খুব উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার করে গ্রাহকদের সম্পূর্ণ সুরক্ষিত পরিষেবা প্রদান করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ক্ষণিকের ভুলে বা বিভিন্ন প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়ে হ্যাকারদের কাছে নিজেদের ব্যাঙ্ক একাউন্টের নিরাপত্তাজনিত অনেক Code শেয়ার করে দেন। যার ফলস্বরূপ হ্যাকাররা সেই সুযোগে গ্রাহকদের একাউন্টের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেয় এবং টাকা তুলে নিয়ে যায়।

এইসব ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে ফোন করে কখনোই কোনো প্রকার KYC Update এর কথা বলা হয় না। শুধু প্রয়োজনে Pan বা আধার কার্ড নিয়ে আপনাকে আপনার ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে বলা হতে পারে। ATM Card– Credit Card সংক্রান্ত কোনো বিষয় ফোন কলের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক জানতে চায় না। আপনার Card Block হয়ে গেলে আপনি নিজে ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে Unblock করাতে হবে বা নতুন Card এর জন্য দরখাস্ত করতে হবে। KYC বা Card সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অপরিচিত ব্যক্তির ফোন থেকে আসা কোনো প্রকার Link-কে প্রেস করে Link এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করবেন না।

আমাদের এই দেশ যতই ডিজিটাল লেনদেনের কথা বলছে কিন্তু মনে রাখতে হবে দেশের Android ফোন ব্যবহার করার মানুষের প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ মানুষ Technologically Updated না। বেশিরভাগ মানুষ শুধুমাত্র অন্যকে ফোন করা বা ফোন রিসিভ করা এবং হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক করতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উন্নততর প্রযুক্তির শৈলীকে হ্যাকাররা কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত দেখা যায়, বাড়িঘরে Android Phone শিশুদের ব্যবহার করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে শিশুরা Play Store ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় অনেক App's Download করে নিচ্ছে। যেমন Any Desk যা খুব মারাত্মক App's। এই App's দিয়ে যেকোনো ব্যক্তি Remote থেকে অন্য ব্যক্তির ফোন ব্যবহার করতে পারবে। সেক্ষেত্রে Interest Banking Access করারও সম্ভাবনা থেকে যায়। তারজন্য সতর্ক থাকতে হবে যেকোনো প্রকার App's Download করার ক্ষেত্রে। বিশেষভাবে শিশুদের জন্য শুধুমাত্র Games- এর App ব্যবহারযোগ্য রেখে বাকি সব কিছুতেই Restrict করে রাখতে হবে মোবাইলের মধ্যে (যদিও শিশুদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন দূরে রাখাই শ্রেয়)।

গ্রাহকদের মনে রাখতে হবে ATM Card-এর পেছনে একটা CVV নম্বর থাকে যা শুধুমাত্র Online লেনদেনের জন্যই প্রয়োজন হয়। টাকা তোলা বা জমা দেওয়া বা ট্রান্সফার লেনদেনের ক্ষেত্রে এই CVV নম্বরের কোনো প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে বয়স্ক মানুষেরা ATM কার্ডের CVV নম্বরটি কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে রাখলেই ভালো। তাছাড়া Shoping Mall বা কোনো প্রকার Business Out Let -এ কেনাকাটা করে ATM Card দিয়ে Point Of Sale (POS) মেশিনের মাধ্যমে Payment করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সবার একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি গড়তে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে মজবুত করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের দু'পক্ষেরই সমান ভূমিকা রয়েছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কিন্তু উত্তরোত্তর সাইবার ক্রাইমের বৃদ্ধিতে মূলত ব্যাঙ্কিং শিল্প মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। তাই উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে সেটাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে শুধু আইন করে এই ক্রাইম প্রতিরোধ করা যাবে না। তারজন্য শুধুই প্রয়োজন ব্যাঙ্ক এবং গ্রাহক উভয়কেই সতর্কতা অবলম্বন করা। পাশাপাশি সাইবার ক্রাইমের ঝুঁকির বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। সমস্ত ব্যাঙ্কিং শিল্প এবং গ্রাহক সবাই মিলে একসঙ্গে সাইবার ক্রাইমকে প্রতিরোধ করতে হবে।

ভারত সরকার Inter Department Information Security Task Force (ISTF) নামক একটি দপ্তর তৈরি করেছে National Security Council এর সঙ্গে। যা সতর্কতামূলক বিষয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। প্রতিটি রাজ্যের Police Department- এ সাইবার ক্রাইম নিয়ে আলাদা আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে অভিযোগ গ্রহণ করা ও তদন্ত করার জন্য। পাশাপাশি অনেক রকম আইনও সরকার পক্ষ থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু সব কিছুর উর্ধ্বে হচ্ছে সচেতনতা। অনেক সময় অনেক শিক্ষিত লোকদেরও বলতে শোনা যায় যে, তারা সম্মোহিত হয়ে (Hyptonise) হয়ে উল্টো দিক থেকে Fraud star-এর ফোনে Security Code শেয়ার করে দিয়েছেন। যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে প্রযুক্তিগতভাবে সব ব্যাঙ্কই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছে। তাই এখন শুধু গ্রাহকদের সচেতন থাকা এবং লোভে পা না দেওয়া কাম্য। শুধুমাত্র সতর্কতার দ্বারাই গ্রাহকেরা Fraud Star -দের সাইবার ক্রাইম থেকে মুক্তি পেতে পারে।

বসন্তের ফোটা ফুল

নীলিমা দাশগুপ্ত

বসন্তের ফোটা ফুল যত্ন করে লালন করে গাছ থেকে পেড়ে নেই। কতো সুন্দর রং বাহার ছড়িয়ে মনটাকে ব্যাকুল করে দেয়। পরম তৃপ্তি মনকে ছুঁয়ে যায়। দখিনা বাতাস দখিনা জানালা খুলে যখন দাঁড়িয়ে থাকি অসাধারণ অনুভূতি মনকে গ্রাস করে। মনের কোণে প্রশ্ন জাগে প্রতিটি দিন যদি এমন থাকতো কতো ভালো হতো। প্রকৃতির বিবর্তনে আসে গ্রীষ্ম। প্রচন্ড দাবদাহে বসন্তের ছড়িয়ে দেওয়া রং ঝলসে দেওয়া জানালার ফাঁক দিয়ে রৌদ্র এসে গায়ে লেগে মন অস্থির করে দেয়। জানালা বন্ধ রাখতে হয়। বর্ষার আগমন হয়। ঝাপসা বৃষ্টি জানালা ভিজে শরীর ভিজিয়ে দেয়, মনটা শান্তির ছায়াতলে আপন মনে গেয়ে উঠে কবিগুরুর গান 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' প্রশান্তি দেহ মন আকুল করে উঠে বসন্তের ফোটা ফুলের কথা ভেবে। প্রকৃতি যেমন একভাবে চলে না, জীবনের দিনগুলো একভাবে কাটে না। চাওয়া না পাওয়ার ভিড়ে বসন্তের ফোঁটা ফুল খুঁজে মরি। হয়তো সময়ের বিবর্তনে পাওয়া যাবে, তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বর্ষার ধোওয়া মন নদী গর্ভবতী জলোচ্ছ্বাসে নদীর তীর ভাঙ্গে আবার কোনদিক গড়ে শরৎ অপেক্ষায়। শরৎ সন্ধ্যায় নিকানো উঠোনে ঝরা শেফালীর সে কি আকুতি পুজোর অংশীদার হওয়ার জন্যে, কিন্তু বৃষ্টি ভেজা শেফালী দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে যায়। বসন্ত আসতে অনেক দেরি, কল্পনায় বসন্তের ফোটা ফুল ভেবে ভেবে দিনগুলো কি করে কেটে যায়,হয়তো বসন্ত আসবে আমি আর বসন্তকে সেইভাবে কাছেই পাবোনা। বসন্তের ফোটা ফুল অকালে ঝরে যায়।

জোৎস্না ছড়ানো চিলেকোঠার বারান্দা অন্ধকারে ছেয়ে যায়।
কাজলা রাতের নীরব বাঁশি
বাজে কোন্ সুদুরে,
টলমল চোখের পানি টপটপ পড়ে ঝরে।

কবিতা

পুজো এলে

বাঁধন চক্রবর্তী

পুজো এলেই তোমায় মনে পড়ে মা

ষষ্ঠীর সকাল, ঘুম ভেঙে যায় তোমার
উলুধ্বনিতে/তেলের প্রদীপ জ্বেলে মা
আসবে বলে/ তুমি দুয়ারে দাঁড়িয়ে

ক'দিন ধরেই ঘর-দোর ঝাড় পোছ হলো
পুজোর দিনগুলো নিরামিষ রান্না
পুজোর সময় কেউ কোত্থাও যাবে না
মামা যদি আসেন বিস্কুট নিয়ে
লাঠি নিয়ে তবে দাদু
লম্বা দাদুর উঁচু নাক
তোমায় ডাক তো 'মা' বলে
দাদা-দিদি, ভাই-বোন সবাই মিলে
গল্প -দাদুর আসর বসাতাম

এখন পুজো আসে, উলুধ্বনি নেই
ঢাক বাজে না, তেলের প্রদীপ গেছে হারিয়ে
মোমবাতি জ্বলে না

সপ্তমীতে কে যাবে কালীবাড়ির দুর্গাপূজায়
সঙ্গে আছি আমি নৈবেদ্য সাজায়
একদিকে দশভুজা দুগ্গা, আরদিকে কালীমা
সব দুঃখ দূর করে মুছে দেয় কালিমা।

অষ্টমীতে বাড়ির পুজো, অন্নব্যঞ্জন
আয়োজন/সন্ধ্যায় ঠাকুর দেখতে
যাওয়া, মহাধূমধাম/ তুমি বলতে,'অষ্টমীর
ঠাকুর দেখা ভালো'/ তুমি শুধু পাড়ার ক্লাবে
যেতে/ ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঠাকুর দেখতে।/
সেবার অষ্টমীর সন্ধ্যায় তোমায় নিয়ে ঠাকুর
দেখতে বেরিয়েছিলাম
তুমি পরেছিলে তাঁত বেনারসি
টিউশনের টাকায় কিনেছিলাম মনে আছে
একটু গিয়েই থামলে তুমি
পিছন ফিরে দেখি
তোমার জুতো গেছে ছিঁড়ে!
এখন যাই কী করে?

নবমীর ভোরে রাগ হতো খুব
ঢাকের বাজনায় বিদায়ের সুর

পুজো এলেই আমার মাকে মনে পড়ে

সেই তাঁত বেনারসি —
ইস! মা'র পায়ে জুতো নেই
জুতো কিনতে যাই

এক জোড়া ভালো জুতো দেবেন ভাই
এবার যাবে আমার সঙ্গে অষ্টমীপূজায়?

আগমনী

মণীশ রুদ্রপাল

আজ আলোর মুখে যে সুর বাজে
হৃদয় ছুঁয়ে যায়।
আয় রে তোরা আয়
আগমনীর বাতাস বয়ে যায়।।

যে শিশুটি লুটায় ধূলায়
আপন খেলায়;
কাশের বনে পথও হারায়,
সে কি জানে আগমনীর মানে?
তাই, হৃদয় দোলে দুঃখ দোলায়।।
আলোর মুখে যে সুর বাজে
হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

তবু, ক'দিনের এই খুশির মেলায়
মেলুক আঁখি দুঃখ ভুলে;
শিউলি যখন ফুটলো ডালে
ঝরবে জানি ভোরের বেলায়।
এসো মা দুঃখ-সুখের শ্যামল ধরায়।।
আলোর মুখে যে সুর বাজে
হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

ফ্ল্যাট

নিয়তি রায় বর্মণ

পাশের বাড়িতে হবে মস্ত ফ্ল্যাট
প্রচার করবে নিশ্চয়ই সোশ্যাল নেট।
ঘটবে নির্ঘাত নানা ঝকমারি
ধুপধাপ কাটা হয় গাছের সারি।

আবাসিক পাখিগুলো সব অসহায়
পাখা মেলে ওড়ে গেল কে যে কোথায়!
পাখি বিরহে ছোট্ট সোনা চিকুর
মন হয়ে গেল উদাস বেসুর।

নারকেল আম আতা সেগুন
নানা ফুলগাছ আর বেগুন।
মৌমাছিরা এসে ফিরে গেল না পেয়ে বকুল
কোথায় পাবে চাঁপা আর আমের মুকুল।

ফ্ল্যাটগুলো সেজে ওঠবে ধীরে ধীরে
অনেক ফ্যামিলি থাকবে একে অপরে।
ছোট্ট বন্ধু অনেক আসবে নিয়ে কলকাকলি
পাখির কলতান শুনবে না মণি মলি সহেলি।

গাছ আমাদের নীল গ্রহের অহঙ্কার
তাপ ধূলারেণু ধারণ করে বসুধায় তুলে ঝঙ্কার।
গাছের জন্যই মেঘ আসে—নামে বারিধারা
নানা গাছ শাকসব্জি ফল ফুলে রাখে সৃজন ধারা।

আমি মনে মনে বলি

নারায়ণ ভট্টাচার্য

সকালে ওঠে আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন —
কে যেন হুংকার দিল নতুন কিছু বলো, বাছা।
ভেঙে যায় প্রার্থনার নীরবতা, কেটে যায় সুর।

চেনা মুখ উড়ে চলে ব্যস্ততায়, হৃদয়-মন দুর্লভ।
পাড়ার যে লোকটি সবার সেবাদাস—
কথার ছল শুধু, সবাই চলে এড়িয়ে।
মানবিকতার ভাঙা সেতারের সুর-দিননাট্য ক্রমশ।

এখন দিনকে জড়িয়ে থাকে রাতের অন্ধকার,
দিনের শেষ সুরে বাজে হতাশার প্রলাপ
সকালে ওঠে আমি মনে মনে বলি—
কোথায় আছে আমার সাধের দিনলিপি!

আকাশের হৃদয়ে

পূর্বিতা গুপ্ত

হৃদয়জুড়ে আকাশ প্রতিদিন
খুব ঝলমলে রঙিন,
মেঘে মেঘে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে সারাদিন,
কত প্রিয় কথা আকাশের
কখনো ছুঁয়ে যায়,
মুখ ঢাকি তার গায়ে,
ভালোবাসার সোহাগি চাদরে জড়াই,
চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে
আমি হেরে যাই
হেরে যাই বারবার
আকাশের কাছে.....

দশভুজা

সুপর্ণা মজুমদার রায়

প্রতি ঘরে ঘরে দশভুজারা
দিনরাত্রি খাটে,
কখনো একা সংসারেতে
কখনো মাঠে ঘাটে।
কখনো বা কলকারখানায়
কখনো দিনমজুর,
দশভুজারা পেটের দায়ে
জাগে রাত ভোর।
সেবার কাজে দশভুজা
স্নেহের হাতটি বাড়ায়,
পণ্য বিক্রয়ে দশভুজা
রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়।
রক্তাল্পতায় দশভুজারা
ভুগছে নানান রোগে,
কিংবা অচল শরীর নিয়ে
অপুষ্টিতে ভোগে।
পণের দায়ে দশভুজা
জ্বলছে দিনরাত,
স্বার্থের তাগিদে কেউ কোনদিন
দেয় না তাদের সাথ।
চাকরি বাঁচাতে দশভুজা
মিছিলে মিছিলে হাঁটে,
সমাজ কল্যাণে দশভুজা
দুর্বার গতিতে ছুটে।
পরিচয়হীন দশভুজা
মায়ের কোলে পিঠে,
ডাস্টবিনেতে দশভুজা
কুকুররা জিভ চাটে।
বিদুষীনি বেশে দশভুজা
যুগে যুগে অবতীর্ণা,
লিঙ্গ ভেদে পরিত্যক্তা
অগণিত দশভুজা কন্যা।
জনহিতে দশভুজারা
বাড়িয়ে তাদের হাত,
পাষণ্ড সমাজে পায় শুধু
লাঞ্ছনা, পদাঘাত।
মৃন্ময়ীরূপী দশভুজা
আলোক মালায় সজ্জিতা,
রক্ত মাংসের দশভুজারা
রাত আঁধারে ধর্ষিতা।
মাটির প্রতিমা দশভুজার
অসুর নিধন রূপ,
অত্যাচারিত দশভুজা
ঘরের কোণে নিশ্চুপ।
চিন্ময়ী রূপী দশভুজারা
কখনো বহ্নিশিখা,
কখনো বা দেশের কপালে
পরায় জয়ের টীকা।
চোখের জলকে তুচ্ছ করে
নিজের ভবিষ্যত রচে,
জীবন যুদ্ধে দশভুজা
আপন শর্তেই বাঁচে।

ইচ্ছে হয় ঘুরে আসি

টিংকু রঞ্জন দাস

মাঝে মাঝে মনে হয় একটু ঘুরে আসি
লোকালয় ছেড়ে বহুদূর
মেঠো পথ ধরে কোন গাঁয়ে
যেখানে থাকবে না কোন কোলাহল
বায়ু দূষণ কিংবা শব্দ দূষণ
যেখানে আছে শুধু ভাব, প্রাণের স্পন্দন
প্রান্তিক মানুষ যারা দেশকে ভালোবেসে
নীরবে গড়ে তুলছে দেশের বুনিয়াদ।

মাঝে মাঝেই মনে হয় একটু ঘুরে আসি
আলপথ ধরে কোন কৃষাণীর কুটিরে
যেখানে নেই কোন মুখোশের ভীড়
লোক দেখানো আড়ম্বর
যেখানে আছে শুধু আত্মার মিলন, একাত্মতা
সহজ সরল মানুষগুলোর নিষ্পাপ চোখ
যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবতায় কোন ফারাক নেই।

ইচ্ছে হয় সত্যিকারের দেশপ্রেম দেখতে
হঠাৎ করে চলে যাই সবুজ ফসলের মাঠে
ইচ্ছে হয় তোমাকে দেখাই প্রকৃত ভারতবর্ষ
যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
কখনো কৃষক কখনো শ্রমিকের বেশে
অজান্তেই করে যাচ্ছে দেশের সেবা
যাদের নেই কোন আক্ষেপ, বড়াই করতে জানে না
সহজ সরল সেইসব মানুষদের দেশপ্রেমের গল্পে
তোমাকে নিয়ে ঘুরে আসি কিছুক্ষণ সময়।

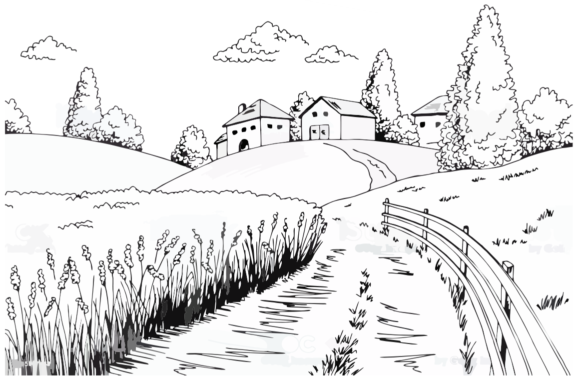

চিকিৎসা

নীরব আততায়ী ডায়াবেটিস

ডা: সুশান্ত কুমার সেন
(ডায়াবেটিস রোগের বিশেষজ্ঞ)

ক্লাবের সক্রিয় কর্মী সমরবাবু। ৫৫ বছর বয়সেও তরুণদের মতোই সবকিছুতেই উদ্যম তার। ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক বা চাঁদা কাটা। সবার আগে এই সমরবাবুকেই দেখা যায়। মানুষের বিপদ-আপদে রাতবিরেত পাশে থাকেন তিনি। সারাদিন অফিস করে এসে, ঘর সংসার সামলিয়েও সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সদা খোস মেজাজে থাকা সমরবাবুকে ক'দিন ধরে নিস্তেজ মনে হচ্ছিল। আগের চেয়ে অনেক রোগাও লাগছিল। সেই ফূর্তি যেন কম মনে হচ্ছিল তার মধ্যে। পাড়ার সবারই এক জিজ্ঞাসা — শরীরটা ভালো তো সমরবাবু?

শরীরটা যে কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না তা নিজেই বুঝতে পারছেন তিনি। সারাদিন একটা ক্লান্তি ক্লান্তি ভাব, বারবার গলা শুকিয়ে উঠছে। প্রস্রাবও ঘন ঘন হচ্ছে। পরিজনরা ডাক্তার দেখানোর কথা বলছেন। প্রথম প্রথম বিষয়টি তেমন পাত্তা দেননি। কিন্তু সামান্য পরিশ্রমে এখন অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন বুঝতে পেরে ডাক্তারের কাছে যান সমরবাবু। শেষ পর্যন্ত তার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। ডাক্তার বলেছেন, অনেকদিন ধরেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত সমরবাবু। সমরবাবু একা নন, ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞদের মতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ টেরই পান না যে তাদের ভেতর এই রোগ বাসা বেঁধেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৬ কোটি, যা ২০৩০ সালে ৫৮ কোটিতে পৌঁছবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। চীনের পরে ভারতেই এই রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ডায়াবেটিস হচ্ছে নীরব আততায়ী। অবহেলায় তা মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। এ অবস্থায় ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সময়মতো চিকিৎসাসেবা নিতে হবে। এই রোগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে রোগীরা একটু চেষ্টা করলেই ডায়াবেটিস নিয়েও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন। তবে রোগ হবার আগেই এর প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে।

আসলে ডায়াবেটিস রোগটি হচ্ছে আমাদের শরীরের প্যানক্রিয়াস নামের একটি অঙ্গ থেকে ইনস্যুলিন নামের একটি হরমোনের নিঃসরণে ঘাটতি অথবা অকার্যকারিতার জন্য শর্করা, চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের গোলযোগের কারণে শরীরের একটি বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থা। এই রোগটি হলে রক্ত থেকে শর্করা বা গ্লুকোজ শরীরের কোষে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে।

রক্তে শর্করার স্বাভাবিক মাত্রা :

খালি পেটে — ১০০ মিঃগ্রাঃ এর কম প্রতি ১০০ মিঃ লিঃ রক্তে।

খাবার ২ ঘন্টার পর — ১৪০ মিঃগ্রাঃ এর কম প্রতি ১০০ মিঃলিঃ রক্তে।

ডায়াবেটিস রোগের উপসর্গ :

- অতিরিক্ত তেষ্টা পাওয়া।
- ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া।
- সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করা।
- হাতে বা পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরা অথবা অনুভূতি কম পাওয়া।
- যৌনাঙ্গে চুলকানি।
- অতিরিক্ত খিদে পাওয়া।
- দ্রুত শরীরের ওজন কমতে থাকা।
- শরীরের কোনো কাটা/ঘা শুকাতে দেরি হওয়া।
- চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া।
- ঘন ঘন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া।

কাদের ডায়াবেটিস হতে পারে:

- যাদের বংশে ডায়াবেটিস রোগী আছেন।
- যাদের শরীরের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। (স্বাভাবিক ওজন কেজিতে উচ্চতা সেমিঃএ – ১০০)। উদাহরণ : ১৫০ সেমি - ১০০ = ৫০ কেজি।
- যারা অত্যধিক মানসিক চাপে থাকেন।
- যারা কম শারীরিক পরিশ্রম করেন।

যে সমস্ত মহিলাদের :

- বারবার গর্ভ নষ্ট হয়।
- মৃত সন্তানের জন্ম হয়।
- বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়।
- ৩.৫ কেজির বেশী ওজনের সন্তান প্রসব হয়।

ডায়াবেটিস কত রকমের হয়

ডায়াবেটিস সাধারণত ৪ রকম :-

১) টাইপ - ১ (শিশু বয়সে রোগ নির্ণিত হয়)।

২) টাইপ - ২ (যৌবনে বা তারপর রোগ নির্ণিত হয়)।

৩) গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস (প্রথমবার গর্ভাবস্থায় নির্ণীত হয়)।

৪) অন্যান্য (বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে বা অন্য রোগের কারণে)।

রোগ নির্ণয়:

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

খালি পেটে- গ্লুকোজের পরিমাণ প্রতি ১০০ মিঃলিঃ রক্তে ১২৬ মিঃগ্রাঃ বা তার বেশী থাকলে।

অথবা

যে কোন সময় / খাবার ২ ঘন্টার পর —

গ্লুকোজের পরিমাণ প্রতি ১০০ মিঃলিঃ রক্তে ২০০ মিঃগ্রাঃ বা এর বেশী থাকলে।

যাদের প্রতি ১০০ মিঃলিঃ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খালিপেটে ১০১ থেকে ১২৫ মিঃগ্রাঃ অথবা যে কোন সময়/খাবার ২ ঘণ্টা পর ১২৬ থেকে ১৯৯ মিঃগ্রাঃ, তাদের ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা:

ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ। এই রোগের চিকিৎসা আজীবন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে।

১) বিনা ওষুধের চিকিৎসা :

ওষুধ ছাড়াও ডায়াবেটিসের চিকিৎসা আছে।

ক) খাবার – ডায়াবেটিসের চিকিৎসার অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে পরিমিত ও সুষম আহার গ্রহণ করা, যাতে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভাত বা রুটি খেতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণে। আর পেট ভরাতে হবে শাক - সবজি দিয়ে। সঙ্গে থাকবে পরিমিত দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ও ফল যার যার খাদ্যাভ্যাস ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী। রান্নায় ব্যবহার করা ছাড়া অন্যভাবে তেল ও লবণ খাওয়া উচিত নয়।

খ) ব্যায়াম — ব্যায়াম করলে শরীরের চর্বিজনিত অতিরিক্ত ওজন কমে, রক্তে শর্করার মাত্রা কমে, ওষুধের প্রয়োজন কমে ও জীবনের মান উন্নত হয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ কিমি জোরে হাঁটা অথবা ৩০ মিনিট দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা বা মাঠে খেলাধুলা করা উচিত। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যথা, জ্বর ইত্যাদি হলে ব্যায়াম করা উচিৎ নয়। খালি পেটে বা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা বা ব্যায়াম করা উচিত নয়।

২) ওষুধের চিকিৎসা :

ক) খাবার ওষুধ— খাদ্য ও ব্যায়ামেও যদি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তবে টাইপ-২ জাতীয় ডায়াবেটিস রোগীদের খাবার ওষুধ দেয়া হয়। খাবার ওষুধ কিন্তু ইনস্যুলিনের বিকল্প নয়।

খ) ইনস্যুলিন--- যে সমস্ত রোগীদের অগ্ন্যাশয়ে ইনস্যুলিনের উৎপাদন হয় না বা কম হয় বা যাদের খাবার ওষুধে কাজ হয় না তাদের ইনস্যুলিন নিতে হয়। বিশেষ কোন অসুখের সময়, গর্ভাবস্থায়, স্তন্যপান করানোর দিনগুলিতে বা অপারেশনের সময়ও সাময়িকভাবে ইনস্যুলিন নিতে হয়।

খাবার ওষুধ বা ইনস্যুলিন চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নেয়া, মাত্রার পরিবর্তন করা অথবা বন্ধ করা উচিত নয়। ইনস্যুলিনের প্লাস্টিকের সিরিঞ্জ গরম জলে ফোটানো ও সূঁচ স্পিরিট দিয়ে মোছা ঠিক নয়। ইনস্যুলিন পেটে, হাতে, পায়ে বা কোমরে নেওয়া যায়। ইনস্যুলিন নেবার সঠিক পদ্ধতি চিকিৎসক বা অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিলে নিজে নিজেই সেটা নেওয়া যায়।

রক্ত পরীক্ষার দিন এবং আগের রাতেও ওষুধ/ইনস্যুলিন নিতে হবে নিয়ম অনুযায়ী। খাবার ওষুধ বা ইনস্যুলিন সকালে ভাত/রুটি খাবার আগে বা পরে নিতে হবে।

হাইপোগ্লাইসিমিয়া বা রক্তে শর্করার পরিমাণ অস্বাভাবিক কমে যাওয়া-

চিকিৎসা চলাকালীন ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা অস্বাভাবিক হারে কমে যেতে পারে। এই অবস্থাটা খুব ভয়ানক। সময়মত সঠিক চিকিৎসা না হলে রোগী গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

উপসর্গ :

অতিরিক্ত খিদে পাওয়া, অস্বাভাবিক ঘাম হওয়া, বুক ধরফর করা, দুর্বলতা বোধ করা, ভীতির ভাব হওয়া, মাথা ব্যথা করা, কোনো বিষয়ে মনসংযোগ করতে না পারা, জিভে আড়ষ্টতা বোধ করা, একটি জিনিসকে দুটো করে দেখা, অস্বাভাবিক আচরণ করা হাইপোগ্লাইসিমিয়ার উপসর্গ।

চিকিৎসা:

সামান্য উপসর্গে চিনি দিয়ে চা, কফি বা দুধ পান করা বা যে কোনো খাবার খাওয়া। বেশী মাত্রার উপসর্গে সঙ্গে সঙ্গে কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ মত শিরার ভেতর দিয়ে গ্লুকোজ নিতে না পারলে ফল মারাত্মক হতে পারে।

ডায়াবেটিসের জটিলতা :

ডায়াবেটিস হচ্ছে নীরব আততায়ী। এই রোগ কখনো নির্মূল হয় না। দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় বা অনিয়মিত চিকিৎসায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের যে কোন অঙ্গের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে এই রোগ। এরমধ্যে চোখ, কিডনি, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পায়ের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এমনকি এরফলে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার পরেও রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

যে খাবারগুলি খেলে ডায়াবেটিস রোগ ও তার জটিলতাগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টসাধ্য —

- চিনি, গুড়, বাতাসা, মধু, গ্লুকোজ, মিষ্টি খাবার, জ্যাম, জেলি।

- ময়দার বিস্কুট, কেক, চকোলেট, আইসক্রীম, মেয়নীজ, মার্জারীন।

- পাকা কলা, পাকা কাঁঠাল, পাকা আম, সপেদা, আঙুর, সীতাফল, কিসমিস, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, পেস্তা, নারকেল।

- ডাবের শাঁস/জল, আনারস, আখ, খেজুর ও অন্যান্য মিষ্টি ফল।

- আলু, রাঙাআলু, বীট, কচুর মূল।

- ভাজা খাবার, ডিমের কুসুম, পাঁঠার মাংস, মুরগীর মাংসের চর্বি, পশুপাখীর লিভার, মস্তিষ্ক, কিডনি।

- মাখনসহ দুধ, দুধের সর, ঘি, মাখন, নারকেল তেল, পামতেল, বনস্পতি তেল।

ফল খাওয়া যাবে : আপেল/নাসপাতি/কমলা/জাম/কামারাঙা/পাঁকা পেপে/পেয়ারা/তরমুজ।

ডায়াবেটিস রোগের প্রতিরোধ:

রোগ হবার আগেই এর প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে। রোগ হলে সঠিক চিকিৎসা করে এর জটিলতা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করতে হবে। জটিলতা হয়ে গেলেও সঠিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতে হবে। এভাবে ডায়াবেটিসের মতো একটি মারাত্মক রোগ হলেও রোগীরা একটু চেষ্টা করলেই ডায়াবেটিস রোগটি নিয়েও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

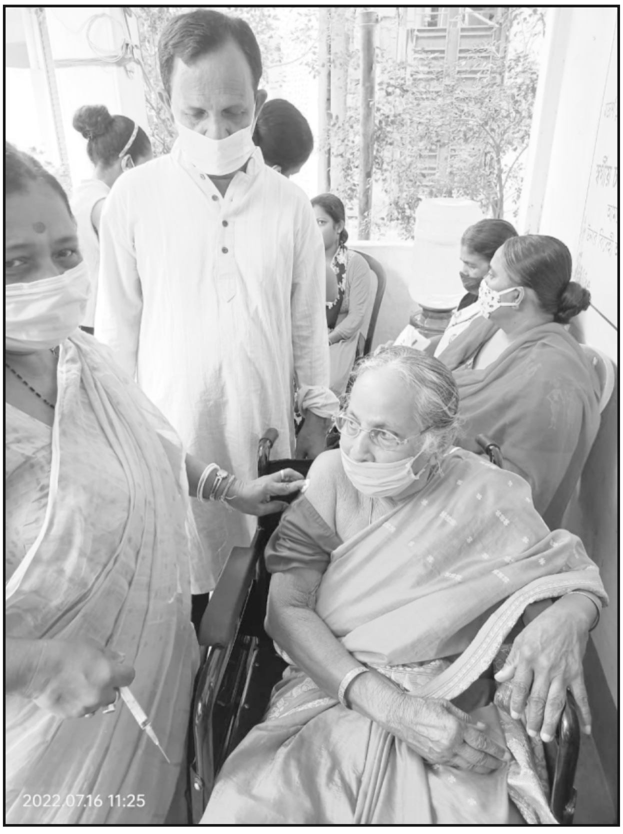

মডার্ণ ক্লাবে বিশেষ শিবিরে করোনা প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে

গল্প

ফেইক মুখ

শোভা দেববর্মা

'ফেইসবুক? ফেইসবুক না আর কিছু— আমার মাথা,যত্ত সব বদমাশ চালবাজের দল', রাগে গনগন করে জ্বলছে আর টগবগ করে ফুটছে অনিন্দিতা। একটু দূরে সোফায় বসে বাবাই—তার হাতেও মোবাইল। অনিন্দিতা আড়চোখে একবার তাকায় ছেলের দিকে, বিদেশে থাকে, অল্প কিছুদিনের জন্য বাড়ীতে এসেছে সে। অনিন্দিতা চেঁচিয়ে ছেলেকে বলে 'এ্যাই— ফেইসবুক করছিস? বন্ধ কর — বন্ধ কর—সারাদিন শুধু মোবাইল নিয়ে বসে বসে ফেইসবুক ঘাঁটাঘাঁটি—তাই না? বন্ধ কর বলছি'। বাবাইও সমানতালে চেঁচিয়ে বলে 'আরে না না , আমি ফেইসবুক করছি না, অন্য একটা কাজ করছি'—আসলে সেও বসে বসে রিমির সঙ্গে ম্যাসেঞ্জারে চেটিংই করছিল, মাকে মিথ্যে কথা বলে সে, আর অনিন্দিতা সেটা ভালই বুঝতে পারে। এবারে মুখ তোলে বাবাই একবার মা'র দিকে তাকায়, মা'কে ফেইসবুকে একাউন্টটা সেই খুলে দিয়েছিল। মা সারাদিন বাড়িতে একা থাকেন আর সে নিজেও তো থাকে বিদেশে, তাই ভেবেছে মা যদি ফেইসবুক নিয়ে সময় কাটায় তাহলে মন্দ কি? প্রথম প্রথম মা পাসওয়ার্ড ঘনঘন ভুলে যেতেন এখন আর তা হয় না। বাবাই মুখ তোলে জিজ্ঞেস করে 'কি হলো কি? কোন সমস্যা?' অনিন্দিতা বলে 'দেখ না , হাঁটুর বয়সি ছেলে বলে কিনা আই লাভ ইউ!' হেসে ফেলে বাবাই— হা হা করে হাসে, তাকায় মা'র দিকে— সত্যি— ওর মা আজও ভীষণ সুন্দরী, মনেই হয় না এতো বয়স হয়েছে, একটু গর্ব বোধ করে বাবাই। 'মা সাবধানে চেটিং করবে, অনেক ফ্রড লোকও আছে কিন্তু, নানাভাবে কথার জালে আটকে পরে টাকার জন্য ব্লেকমেইলও করতে পারে, সব পুরুষ কিন্তু পুরুষ বন্ধু নাও হতে পারে আবার মেয়ে বন্ধুরাও মেয়ে নাও হতে পারে, সুতরাং খুব সাবধান মা'। অনিন্দিতা সাবধান হোক বা না হোক কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়, অন্তত এই ছেলেকে কেউ চীট করতে পারবে না, এবারে হেসে ফেলে সে।

অনেক কষ্টে নিজের সমস্ত কিছু উজাড় করে দিয়ে এই ছেলেকে বড় করেছে অনিন্দিতা। প্রবাল যখন ওদের ছেড়ে চলে যায় তখন আর কতইবা বয়স বাবাইয়ের—ক্লাশ থ্রীতে পড়ে তখন, আর আজ ? গর্ব হয় অনিন্দিতার নিজের ছেলের জন্য, মনে হয় এতো বছরের যুদ্ধ আজ শেষ, আজ সে বিজয়ী, তবু একটা চিনচিনে কষ্ট ওর বুকে থেকেই যায় প্রবালের জন্য। কেন যে ওদের দু'জনের মধ্যে বনিবনা হলো না মাঝে মাঝে তা সত্যিই ভেবে পায় না অনিন্দিতা। ওরা দু'জনেই ডাক্তার, একই কলেজ থেকে পাশ করেছিল, নিজেরা ভালোবেসে বিয়েও করেছিল অথচ বিয়ের পর দু'জনে একসঙ্গে দশ বছরও সংসার করতে পারল না! কিসের সংঘাত? ব্যক্তিত্বের? ভেবে পায় না অনিন্দিতা। আজ এই বয়সে এসে সে ভাবে তার হয়তো আরো একটু বেশি সহিষ্ণু হওয়া উচিত ছিল। আজও সে প্রবালকে আইনত ডিভোর্স দেয়নি, আঠারো বছর আগে সেই যে লোকটা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই। অনিন্দিতা ভাবে আবার যোগাযোগ হলে প্রবালকে সে ডিভোর্সটা দিয়েই দেবে। পিটিং করে আওয়াজ হয় মোবাইলে —ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ এসেছে, অনিন্দিতা একটু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ডাইনিং টেবিলের উপর থেকে মোবাইলটা তুলে নেয়, ঠিক, যা ভেবেছে ঠিক তাই— অনিমেষের মেসেজ— গুডমর্নিং মেসেজ, অনিন্দিতা সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই দেয়। এতক্ষণ আড়চোখে মা'কে দেখছিল বাবাই, এবারে একটু মুচকি হেসে নিজের ঘরে ঢুকে পরে সে।

অনিমেষের সঙ্গে ওর ফেইসবুকে বন্ধুত্ব —তাও প্রায় বছর তিনেক হয়ে গেল। অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি বলেই মনে হয় তাকে, বিদেশে থাকেন, স্ত্রী আছেন, ছেলেও আছে, কই — মিথ্যে কথা তো বলেননি, যা সত্য তাই তো বলেছেন—ভাবে অনিন্দিতা। শুধু মনের মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতা সবসময় তাকে কুড়ে কুড়ে খায় ---এই বয়সে এসে জীবনের সব ভুলভ্রান্তিগুলো মিটিয়ে ফেলে এবারে সুস্থভাবে বাঁচতে চায়—জানায় অনিমেষ। অনিন্দিতাও প্রকৃত বন্ধুর মত তাকে

সবসময় নানারকম উপদেশ, মতামত দিয়ে জীবনের সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখায়। অনিন্দিতার জীবনেও তো ঘাত-প্রতিঘাত কম আসেনি– সেও তার জীবনের সমস্ত দুঃখ, দ্বন্দ্ব অনিমেষের সঙ্গে শেয়ার করে নেয়। এইভাবেই আস্তে আস্তে এই তিন বছরের মধ্যে তাদের দু'জনের একটা অদ্ভুত সুন্দর বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছে। কিন্তু অনিন্দিতার হয়েছে ভারী মুশকিল, কত যে ছেলে বন্ধু কত ভাবে কত প্রস্তাব দেয় তার ইয়ত্তা নেই, সবই যে ফালতু বদমায়েশি তা এখন সে ভালই বুঝতে পারে। না ও ভাবে অনিমেষকে জানাবে, বাবাই বলেছে সাবধানে চেটিং করতে, কথার জালে আটকে ফেলে পরে নাকি আবার ব্লেকমেইলও করতে পারে! কি কান্ড! ছেলেগুলো নাকি আবার মেয়েও হতে পারে! মোবাইলে মেসেজটা টাইপ করে অনিমেষকে পাঠায় সে, উঠে একবার রান্নাঘরেও যায়, হাতের কাজগুলো দ্রুত সেরে নেয়। আওয়াজ হয় পিটিং— অনিন্দিতা মেসেজ বক্স খোলে, অনিমেষ লিখেছে 'হা হা হা — আরো শোন, বিদেশী নাম নিয়ে যে সব ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে সেগুলো কিন্তু বিদেশী নাও হতে পারে— বেশিরভাগই ফেইক মুখ হয়— বুঝেছ? বিভিন্ন কল সেন্টার থেকে ওরা বিদেশী নাম্বার যোগাড় করে, ওই নাম্বার থেকে ফোনও করতে পারে— তারপর নানা অজুহাতে টাকা আদায় করে।' সত্যিই তো! অবাক হয় অনিন্দিতা। বছরখানেক আগে কেভিন এলেক্স নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক ওকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল আর সেও তা একসেপ্ট করেছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওরা ফোন নাম্বারও দেয়া নেয়া করে। এরপরেই একদিন এলেক্স ওকে বলে সে নাকি অনিন্দিতার বাড়ির ঠিকানায় প্রচুর উপহার পাঠিয়েছে, অনিন্দিতাকে তা ছাড়িয়ে নিতে হবে, প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে! বিরক্ত হয় অনিন্দিতা, রাগও হয়েছিল তার, পরে সে এলেক্সের নাম্বারটা ব্লক করে দেয়। এরপরে তো আরো অবাক কান্ড, অনিন্দিতা খুঁজে পায় বিভিন্ন নামে এলেক্সের আরো অনেক ফেইক একাউন্ট— তার মানে এলেক্স একটা ফেইক মুখ! এখন অনিমেষের কথা শুনে সে সব আরো ভালোভাবে বুঝতে পারে, বুঝতে পারে কিভাবে বিদেশী নাম্বার থেকে এলেক্স ওকে ফোন করত। মনে মনে বলে অনিন্দিতা— 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ অনিমেষ'।

অনিন্দিতার ফেইসবুক ফ্রেন্ডের সংখ্যা এখন এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে, আরো অনেক বেশি সড়গড়ও হয়ে গেছে সে এখন। কিন্তু অনিমেষ আজও আছে, মনের আরো কাছাকাছি, বন্ধুত্ব আরো গভীর। প্রতিদিনের সমস্ত ঘটনা রাত্তিরে একবার অনিমেষকে বলতে না পারলে অনিন্দিতার ঘুমই আসে না, আর অনিমেষ? দিনে কতবার যে সে ফোন করে, মেসেজ করে অনিন্দিতাকে তার ইয়ত্তা নেই। বন্ধুত্ব যত গভীর থেকে গভীরতর হয় ততোধিক পরস্পর বিশ্বাসও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। অনিন্দিতা আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারে অনিমেষকে যে প্রবালের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার জন্য সে নিজেও অনেকাংশে দায়ী, এই বয়সে এসে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, অনেকদিন থেকে সে মনে মনে প্রবালকে খুঁজছেও--- শুধু একবার ক্ষমা চাইবে বলে। তেমনি অনিমেষও নিজের অনুভূতির কথা জানায় অনিন্দিতাকে, তার সন্দেহ, ঈর্ষা প্রতিমুহূর্তে তার স্ত্রী, পরিবারকে তার নিজের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আজ সেই ভুলগুলো সে নিজেও শোধরাতে চায়। সুন্দর নির্মল বন্ধুত্ব ষাটোর্ধ্ব দুই ব্যক্তিকে মনের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে।

অনিমেষই একদিন হাসতে হাসতে প্রস্তাব দেয় 'এসো— আমরা একদিন মীট করি—তুমি তো জানই না আমি দেখতে কেমন, আমার টাইমলাইনে তো শুধুই ফুলের ছবি দেয়া'। অবাক হয় অনিন্দিতা, সত্যিই তো! কখনো তো সে ব্যাপারটা তেমনভাবে ভেবেই দেখেনি! এত বছর হয়ে গেল একবারও তো সে অনিমেষকে বলেনি নিজের ছবি আপলোড করতে ! সুতরাং অনিমেষের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে যায় অনিন্দিতা। অনিমেষ জানায় অফিসের কাজে সে ইন্ডিয়া আসবে কয়েকদিনের মধ্যেই— তখন সে দেখা করবে আনিন্দিতার সঙ্গে।

নির্দিষ্ট দিনে সুন্দর করে সেজে অনিন্দিতা এয়ারপোর্টে যায় অনিমেষকে রিসিভ করতে। অনিমেষ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে সে নীল রঙের শার্ট পরে আসবে আর হাতে থাকবে একগোছা গোলাপ ফুল। অধির আগ্রহে অনিন্দিতা দাঁড়িয়ে থাকে এরাইভেল গেইটের সামনে— খোঁজে নীল রঙের শার্ট, গোলাপগুচ্ছ— হঠাৎই অনিন্দিতা দেখতে পায় হাতে একগোছা গোলাপ নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে নীল রঙের শার্ট —একটা ফেইকমুখ—প্রবাল।

এক নজরে

রইস্যাবাড়ী আর ডি ব্লক

- MGNREGA প্রকল্পে রইস্যাবাড়ী আর ডি ব্লকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৬,৯৪,১৮৩ শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে ১১৭.৮৪ দিন দিয়ে ৫,৮৯১ টি জব কার্ড হোল্ডারদের সফলতা করে রইস্যাবাড়ী আর ডি ব্লক উন্নয়ন অগ্রগতি এগিয়ে রয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে রইস্যাবাড়ী আর ডি ব্লকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৬৬৩ জন বেনিফিসিয়ারি লক্ষ্যের, প্রথম কিস্তি ৬৬৩ জন, দ্বিতীয় কিস্তি ৬৫৩ জন, তৃতীয় কিস্তি ৬১৩ এবং ৬৫২ জনের ঘর সম্পূর্ন করেছি। এবং Awass+৪৯৭ জনের মধ্যে ৪২০ জন প্রথম কিস্তি দেওয়া হইয়াছে।
- SBM(G) IHHL প্রকল্পে রইস্যাবাড়ী আর ডি ব্লকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৭৪৩ জনে শৌচালয় প্রদান করা হইয়াছে।
- TRLM হইতে, ৪ (চার) টি VO থেকে ৪০ (চল্লিশ) টি লোন প্রদান করে রইস্যাবাড়ী এলাকায় মহিলা সংগঠনকে স্বাবলম্বি করেছি।
- তাছাড়া বিভিন্ন সংশ্লিষ্টদের এর সাথে সমবায়ের মাধ্যমে সকল স্তরের নাগরিক এবং শুভাকাঙ্খীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ব্যবস্থা এবং দ্রুত নগরিক পরিষেবা প্রদানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত এবং দায়বদ্ধ এই ব্লক।

সৌজন্যে ঃ রইস্যাবাড়ী আর ডি ব্লক

চিকিৎসা

ওষুধে নয়...
ব্যয় করুন সুস্বাস্থ্যে

ডা: অভিক চক্রবর্তী

সকালে উঠেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো আকাশের। পাশের বাড়ির শুভদা হঠাৎ গত হলেন। খুব প্রাণবন্ত ছিলেন তিনি। ঘুমের মধ্যেই স্ট্রোক করে ৪৫ বছরের জীবনজ্যোতি নিভে গেলো। হাইপ্রেসার ছিলো। মাঝেমধ্যেই ওষুধ খেতেন না। ওষুধ আনছি-আনবো করে সব শেষ। আরও অনেকেই আছেন ওদের পাড়ায়। 'স্ট্রোক' করে বিছানাতেই আবদ্ধ। কেউ সিগারেট খাওয়া ছাড়তে পারলো না। কেউ প্রেসারের বা কোলেস্টেরলের ওষুধ খান না বা ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে নেই।

"অনেক যুবক কার্ডিয়াক সমস্যায় ভুগছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অকালে মারাও যাচ্ছেন। অনুপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন সবই প্রতিরোধযোগ্য। যা প্রাথমিক পর্যায়ে সমাধান করলে এই ধরনের গুরুতর অসুস্থতাকে প্রতিরোধ করা যায়।..."

ডাক্তারি পড়ার সময় বই আর স্যারদের পড়ানো মনে পড়ে গেলো আকাশের। ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, উচ্চ কোলেস্টেরল, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড সবই দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগ। দিনের পর দিন এই সব জীবনধারা সম্পর্কিত রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। ভারতেই প্রতি দশজনের একজন ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। আর প্রতি চারজনের একজনের প্রিডায়াবেটিস। আমাদের দেশে প্রতি তিনজনের একজন উচ্চরক্তচাপ নিয়ে ভুগছেন। তাদের অর্ধেকেরই এটা জানা থাকে না। বাকি অর্ধেক মানুষ যাদের হাইপ্রেসার আছে, তারা আবার ট্রিটমেন্ট করেন না। আকাশ ইন্টার্নশিপের সময় লক্ষ্য করেছিল যে উচ্চরক্তচাপ আর ডায়াবেটিসের পেশেন্টরা হয় স্ট্রোক নিয়ে ভর্তি, আবার কিডনি বিকল হয়ে ডায়ালাইসিস ওয়ার্ডে ভর্তিরত। কেউবা চক্ষু বিভাগে দামী ইনজেকশন নিচ্ছেন রেটিনা বাঁচানোর জন্য। অনেকেই অর্থোপেডিক ওয়ার্ডে ভর্তি পা বা হাতের ইনফেকশনের জন্য। খালি ডায়াবেটিস থাকলেই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। আর সঙ্গে উচ্চরক্তচাপ, ধূমপান, স্থূলকায় শরীর, হাই কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাকের আর স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেক অংশে বাড়িয়ে তুলে। জেনেটিক প্রভাব ছাড়াও মানসিক চাপ, খাদ্যাভ্যাস এবং কায়িক পরিশ্রম না করা এইসব জীবনধারা রোগের সূত্রপাত। অগ্রগতি এবং এর ফলাফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। স্ট্রেস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং যোগব্যায়াম, ধ্যান, প্রাণায়াম চর্চা এবং আচরণগত থেরাপি এটিকে নিয়ন্ত্রণ ও কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। রাতে ৬-৮ ঘণ্টার সঠিক শান্তিপূর্ণ ঘুম স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যারা নাইট শিফট ডিউটি করেন তারা তাদের সমকক্ষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দীর্ঘস্থায়ী লাইফস্টাইল রোগে ভোগেন। ভারতীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেরা বিশেষ করে পেটের স্থূলতা, উচ্চ কোলেস্টেরল,ডায়াবেটিস এবং অকাল কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকিতে রয়েছেন। ৩০ এবং ৪০ বছর বয়সের মধ্যে অনেক যুবক কার্ডিয়াক সমস্যায় ভুগছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অকালে মারাও যাচ্ছেন। অনুপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন সবই প্রতিরোধযোগ্য। যা প্রাথমিক পর্যায়ে সমাধান করলে এই ধরনের গুরুতর অসুস্থতাকে প্রতিরোধ করা যায়।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে। আমরা পূর্বাঞ্চলের জনগণ প্রধানত ভাত খাই। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে আমরা ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধ চাল থেকে আরও পরিশোধিত চালের দিকে চলে এসেছি। গমের ক্ষেত্রেও তাই। ট্রান্স-ফ্যাট এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট ধারণকারী চটজলদি খাবার একটি বিপর্যয়ের রেসিপি। দৈনন্দিন জীবনে খাবারের সঙ্গে কিছু বাদাম ও বীজের সাথে আমাদের খাদ্য তালিকায় ৩-৪ টি ফল ও শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবারের ব্যবহার কমাতে হবে। সকালের প্রাতঃরাশটা বেশি পরিমাণে ব্যালেন্সড ডায়েট নেওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে মাঝারি পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজ ও স্বল্প পরিমাণে ডিনার করার চেষ্টা করা উচিত। প্রোটিন আমাদের খাদ্যাভ্যাসে খুব প্রয়োজনীয় পদার্থ যা আমরা প্রায় সবাই কম

পরিমাণে গ্রহণ করি। প্রোটিন শরীরের পেশীর স্ট্রেংথ বাড়ায় আর ইমিউনিটি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আমাদের খাদ্য তালিকায় তেল নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। আমাদের বুঝতে হবে কোনো তেলই ভালো নয়। যতটা সম্ভব কম সেবন করাই মঙ্গল। তেল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মাসে ৫০০ এম এল তেলের বেশি প্রয়োজন পড়ার কথা নয়।

ব্যায়াম দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার একটি অখণ্ড অংশ গঠন করে। রোগ শুরু হবার আগে ব্যায়াম শুরু করুন। হাঁটা, জগিং, সাঁতারের আকারে ৩০ মিনিটের দ্রুত শারীরিক ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, পেশী প্রসারিত করার ব্যায়াম সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন করলে রোগের সূত্রপাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিরোধ করা যায়। নিয়মিত ব্যায়াম করলে ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত থাকে। ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা অনেকেরই আছে। আর সঙ্গে প্রচুর সংশয়। বেশিরভাগ মানুষই ভাবেন যে ইউরিক অ্যাসিড খালি মাছ, মাংস, ডিম, মুশুরি ডাল আর বীজ জাতীয় সবজি থেকে হয়। সমস্ত খাবারেই কমবেশি ইউরিক অ্যাসিড থাকে। বেশীরভাগ শাকসবজি, ডাল, এমনকি মুশুর ডালও স্বল্প পরিমাণে খাওয়া যায়। রেডমিট, মাংসের মেটে, বেশি পরিমাণে মাছের ডিম, রাজমা এবং অবশ্যই মদ্যপান ইউরিক অ্যাসিড বেশি বাড়ায়। দৈনিক ব্যায়াম, ওজন কমালে আর পরিমাণ মত জল খেলে ইউরিক অ্যাসিড অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত থাকে। আর ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশী হলেই ওষুধ লাগে না। গাঁটের ব্যথা বিশেষ করে পায়ের বড় অঙ্গুলীর গাঁট বারবার হওয়া, ইউরিক অ্যাসিড থেকে কিডনি সমস্যা বা অত্যধিক ইউরিক অ্যাসিড (১০-এর বেশি হয়ে গেলে) সাধারণত চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। ইউরিক অ্যাসিড বাড়ছে মানে সঙ্গে মেটাবলিক সিনড্রোম আছে (স্থূলকায় শরীর, উচ্চরক্তচাপ থাকা, সুগার, কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড হওয়া)। অতিরিক্ত মদ্যপান করা, কিডনি সমস্যা শুরু হওয়া বা কিছু ওষুধের এফেক্টের ফলেও ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে। মেয়েদের ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়স (মেনোপোজ) হওয়া পর্যন্ত ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা সচরাচর থাকে না।

কোলেস্টেরল, এল ডি এল কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকলে ব্রেইন স্ট্রোক আর হার্ট অ্যাটাকের সমস্যা করতে পারে। কোলেস্টেরলের নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনুযায়ী করতে হয়। একজন মধ্য বয়সী যিনি ধূমপান করেন না, প্রেসার, সুগার বা ফ্যামিলিতে কম বয়সী কারোর হার্ট অ্যাটাক হয়নি তার এল ডি এল কোলেস্টেরল ১৬০ অব্দি ওষুধ লাগে না। খালি জীবনযাত্রার পরিবর্তন করলেই চলে। অন্যদিকে, কারোর ডায়াবেটিস থাকলে এল ডি এল কোলেস্টেরল ১০০ এম জি অথবা এর নিচে রাখতেই হয়। সঙ্গে যদি ধূমপান করেন বা হার্ট, কিডনি, উচ্চরক্তচাপের সমস্যা থাকে তাহলে এল ডি এল কোলেস্টেরল ৭০ বা ৫৫ এম জি অথবা ডি এল রাখা বাঞ্ছনীয়। এল ডি এল কোলেস্টেরল কমানোর জন্যে জীবনশৈলী পরিবর্তনের সঙ্গে ওষুধ দীর্ঘদিন খেতে হবে। ডায়াবেটিস থাকলে প্রায় সবারই কোলেস্টেরল কমানোর মেডিসিন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। ট্রাইগ্লিসারাইড খালি বাড়লে ফ্যাটি লিভার হবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। ৫০০ এম জি অথবা ডি এল ছাড়িয়ে গেলে অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) এর সমস্যা হতে পারে। ট্রাইগ্লিসারাইড সঙ্গে কোলেস্টেরল বিশেষ করে এল ডি এল কোলেস্টেরল বেশি হলে হার্ট অ্যাটাকের সমস্যা বেড়ে যায়। ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয়। সঙ্গে ওজন কমানো দরকার। আর বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট (ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি), মিষ্টি পদার্থ, চটজলদি খাবার নেওয়া সীমিত করতে হবে। ফ্যাটি লিভার আজকাল সনোগ্রাফি করলেই ধরা পড়ে। ফ্যাটি লিভারও মেটাবলিক সিনড্রোমের একটা অংশ। তাই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা এবং ওজন কমানোই আসল চিকিৎসা। ৫-১০ শতাংশ ওজন হ্রাস করলে ফ্যাটি লিভার কমে যায়। তবে মদ্যপান আর ওজন বৃদ্ধি হলে আবার পুনরায় ফ্যাটি লিভার দেখা দেয়।

আকাশের বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এর বিখ্যাত উক্তিটির কথা মনে পড়লো আজকের দিনে— 'অনআউন্স অফ প্রিভেনশন ইস ওয়ার্থ এ পাউন্ড অফ কিওর।' আমরা বেশিরভাগই রোগের জটিলতা হবার পর চিন্তিত হয়ে পড়ি। সেইসময়ে চকিৎসা করতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগের জটিলতা নির্মূল করা সম্ভব হয় না। হাসপাতালের ওয়ার্ডে বিভিন্ন রোগের জটিলতা নিয়ে ভর্তি রোগীদের কথা চিন্তা করে আকাশের মন প্রায়ই ভারাক্রান্ত হয়। আকাশ ভাবে এরা একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই আজকে এই পরিণতিটা দেখতে হতো না। অনেকের পক্ষেই দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়বহুল চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়ে উঠে না। একটু সকালে উঠে শরীর চর্চা করা, মৌসুমী শাকসবজি, ফল খাওয়া, ধূমপান আর অতিরিক্ত মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, সময়মতো ঘুমানো, আনন্দে থাকা — এটুকু করলেই অনেক রোগ বা রোগের জটিলতা থেকে দূরে থাকা যায়।

পুজো তো এসে গেলো। পুজো মানেই হইহুল্লোড়। জমজমাট আড্ডা। আর খাওয়াদাওয়া। সবাই নিশ্চয়ই আনন্দ করবেন। তবে নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখে। একবেলা বেশী খাওয়াদাওয়া হলে বাকি বেলায় হালকা খাবেন। ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম একটু বাড়িয়ে দিন ক্যালোরি কমানোর জন্যে। অবশ্যই নিয়মিত ওষুধ নিতে ভুলবেন না। সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করুন। তাহলে ভবিষ্যতে ওষুধের জন্য বেশি ব্যয় করতে হবে না। ওষুধে আনন্দ নেই, আর আনন্দের মতো ওষুধ নেই। সবাই সুস্থ ও নিরোগ থাকুন।

গল্প

ফিরে আসা

নন্দিতা ভট্টাচার্য

জনার্দনের মনে শান্তি নেই। থাকার কথাও না। বলা নেই কওয়া নেই বিশ বছরের বিয়ে করা বউ দুম করে কালীসিদ্ধা হয়ে গেলে কোন্ পুরুষ মানুষের জীবনে সুখ শান্তি থাকে! তার উপর মা কালীর ভর উঠা বউ একঘর লোকের সামনে যখন নিজের স্বামী কে —এই 'জনা, বাবা- বাছা', বলে তুইতোকারি করে তখন লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশে যেতে চায় জনার্দন। প্রতি অমাবস্যায় মা কালীর ভর হয় তার বউ হরিদাসীর উপর। লাল শালু পরা এলোচুলের কালো দশাশই চেহারার হরিদাসী যখন - বোম বোম, বোম কালী ইত্যাদি বলে হাঁক ছাড়ে, পিলে চমকে উঠে তার। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখতে ভীড় করে থাকে গোটা গাঁয়ের লোক। লোকে নানা মানত, মানস করে, দান ধ্যানও করে, তার বউ হরিদাসী এখন গোটা গাঁয়ের লোকের মা। ভর উঠলে লোকেরা নানান কিছু জানতে চায়, হরিদাসী তখন স্বয়ং মা কালী হয়ে তুলকালাম করে। বাড়িটা আর বাড়ি নেই জনার্দনের। হরিদাসীর অলৌকিক লীলাক্ষেত্র, মন্দির। সারাদিন ভক্তদের ভীড়। যখন বাহ্য জ্ঞান থাকেও তখনও হরিদাসীর হাবভাব বড় অচেনা লাগে তার। মুখের ভাষার ঠিকঠিকানা নেই, মেজাজ সবসময় সপ্তমে। ছেলের জন্ম দেওয়ার পর একলামশিয়া হয়েছিল হরিদাসীর। বেশকিছুদিন খিঁচুনি আর আবোলতাবোল বকবকানি করেছিল। পরে অবশ্য সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের ওষুধে সুস্থ হয়ে ওঠে। জনার্দনের ভয় হয়, আদতেই হরিদাসীর মাথা আবার বিগড়ে গেল না তো! মাস দুয়েক আগে একদিন সকাল সকাল হরিদাসী বেজার মুখ করে বলল— বুঝলে নিধুর বাপ, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

জনার্দন হাতের কাজ ফেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে হরিদাসী আবার বলে— আজ থেকে আমার নাম আর হরিদাসী নয়, কালীদাসী। কাল মা আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, এটা কেমন ধারা হল বল দেখিনি, তুই সেবা করিস আমার আর তোর নাম কিনা হরিদাসী! তুই তো আর হেঁদিপেঁচী বৈষ্ণব নোস। তুই স্বয়ং মা কালীর আশ্রিতা। তন্ত্রসাধিকা, শক্তির আধার।

জনার্দন বলেছিল— হরিদাসীই হও আর কালীদাসী, তোমার নাম ধরে তো আর কেউ এখন ডাকাডাকি করেনা। সবাইতো মা মা বলে গড় করে। আমিও তো তোমায় নাম ধরে ডাকার সাহস পাইনা।

— তবুও। মায়ের যখন ইচ্ছে, আমি আজ থেকে কালীদাসী।

তবে হরিদাসী কালিদাসী হওয়ার পর থেকে জনার্দনের সংসারে টাকা পয়সার টানাটানি অনেকটাই লাঘব হয়েছে। ভক্তদের ভেট অনুদানেই দিব্যি চলে যায়। কাজের খোঁজে জনার্দনকে আর হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়না। নৃপতি ঘোষের আরতে মুটের কাজ করে করে হাড় মাস কয়লা করেছে এতোকাল। এখন আর সে বালাই নেই। তবে প্রতিদিন গাদাগুচ্ছের পূজার বাসন মাজা, বাড়িঘর দু'বেলা গোবর জল দিয়ে শুদ্ধ করা, ফুল তোলা, হরিদাসীর পূজার সময় এটাসেটা জোগাড়যন্ত্র করে দেওয়া এসব নানাবিধ কাজ তাকে করতে হচ্ছে। তবে একটা বাড়তি সুবিধা জনার্দনের হচ্ছে, তা হল মা কালীর পূজোতে সুরা এবং সিদ্ধি অতিআবশ্যক। জনার্দনকেই তার জোগাড় করতে হয় এবং পূজা শেষে এই প্রসাদের সিংহভাগই জনার্দন সাবাড় করে। হরিদাসী বা কালীদাসী তখনও ঠিকঠাক প্রকৃতস্থ থাকেনা বলে কোনো ঝামেলা হয়না।

কলতলায় একতাল বাসন নিয়ে বসেছে জনার্দন। হরিবল মিস্ত্রির বিধবা বউ মালতী ভোগের রান্না করতে চলে এসেছে। মালতী কালীদাসীর প্রধান সাকরেদ। পূজাআর্চায় সাহায্য করে, প্রতিদিন ভোগের রান্না করে। বাসন মাজতে জনার্দনের সঙ্গে

হাত লাগায় মালতী। প্রথম প্রথম মালতীর সংসর্গে অস্বস্তি লাগত জনার্দনের। এখন আর তেমন না। আজও কল চেপে জল তুলতে তুলতে তাড়া দিচ্ছে জনার্দনকে— বেলা হয়ে গেল দাদা। মা কখন চান করতে নদীর ঘাটে গেছে। এসেই পূজোয় বসবেন। সব হাতের কাছে না পেলে ক্ষেপে যাবেন।

---ঠাকুরঘরের সব তো রেডি। ফুল, বেলপাতা, কুঁচোনৈবদ্য সবই তো সাজিয়ে রেখেছ। এখন বাসন মাজা হয়ে গেলে সবজিগুলো কেটে দিচ্ছি। তুমি বরং এখন উনুন জ্বালিয়ে ভোগের খিচুড়ির ডালগুলো ভেজে বসিয়ে দাও।

— আজ মা বলেছেন অন্নভোগ। পাঁচরকম ভাজা, ছোলার ডাল, পাঁচমিশালি সবজি আর পায়েস। আমি ছোলার ডাল সেদ্ধ বসিয়ে এসেছি। আপনি বরং নিবারণের বাড়ি থেকে পায়েসের দুধটা আমাকে এনে দিন।

— তুমি তবে এই ফাঁকে একটু চা করে নাও। সকাল থেকে চা'টা পর্যন্ত পেটে পড়েনি। দু'জনে একটু চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার কাজে লাগব।

— সে কি! এখনও কিছু খান নি! আমি এক্ষুণি চা করে দিচ্ছি। শরীরটার তো খেয়াল রাখবেন। মা তো সংসারে থেকেও নেই। তিনি দেবী মা, তাঁর তো আর ইহ জগতের খবর নেবার কথা নয়। নিজের খেয়াল তো আপনাকে রাখতে হবে।

বাসন ধুয়ে ভেজা হাত গামছায় মুছতে মুছতে দাওয়ায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জনার্দন। জীবনটা তার সত্যি কেমন ধারা হয়ে গেল। তাদের একমাত্র ছেলে নিধু আট বছর বয়সে জলে ডুবে মরে গেল। পুত্রশোকের যন্ত্রণা এখনও ভুলতে পারেনি তারা। হরিদাসীর আর ছেলেপুলেও হয়নি। দিনরাত ঠাকুর দেবতা পীর ফকির করতে করতে হরিদাসী নিজেকে আজ হারিয়ে ফেলেছে। ছেলের শোকে কাতর মায়ের জন্য এও হয়তো এক উপশমের পথ। জনার্দনের নিজের জীবনও ছন্নছাড়া। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে জীবনের মাঝ দরিয়ায় সে একা সাঁতরাচ্ছে। শরীর-মনের চাহিদা কমে এলেও ফুরিয়ে তো আর যায়নি!

নিজেকে বড় নির্বান্ধব, একলা মনে হয়। মালতী চায়ের কাপ জনার্দনের হাতে দিয়ে বলে— চা'টা খেয়ে নিন, আমি এক বাটি মুড়ি সর্ষের তেল নুন দিয়ে মেখে আনছি।

—তুমিও একটু কিছু খেয়ে নাও।

— আমি শুধু চা খাব। ভোগের রান্না করব তো, মুড়ি খেতে পারবো না।

মালতীর বদান্যতায় মুগ্ধ হয় জনার্দন। মালতী নিঃসন্তান বিধবা, বয়েস তিরিশের কোঠায়। রূপ তেমন না হলেও তার অসহায়ত্ব আর যৌবনোচিত লালিত্য মাঝে মাঝে আকর্ষণ করে জনার্দনকে। মনের অবচেতনের এই অভিপ্রায়কে সে আস্কারা দেয়নি কোনোভাবে। জীবন ধরে জেনে এসেছে পরস্ত্রীর প্রতি নজর দেওয়াও পাপ—তাই মালতীর প্রতি দুর্বলতাকে দমন করে রাখে সে। আজ মালতীর মনের মধ্যে তার প্রতি মায়ার প্রকাশ দেখে মনটা আবার যেন কেমন ধারা হয়ে গেল। চা আর মুড়ি মাখা খেয়ে দুধ আনতে চলে গেল জনার্দন।

মা কালীর মূর্তির সামনে আজ অমাবস্যার পূজা শুরু হয়েছে। সারা মেঝে পূজার উপকরণ, নৈবদ্য সাজানো। ধুনুচি থেকে গনগনে ধোঁয়া বেরিয়ে সারা ঘর প্রায় অন্ধকার। বড় বড় প্রদীপগুলোতে আগুনের শিখা লকলক করছে। মা কালী চার হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন। কালীদাসী মায়ের পায়ে লাল জবা অঞ্জলি দিতে দিতে— জয় মা, জয় মা, বলে চিৎকার করে চলছে। গুনাই ঢাকি দাওয়ায় বসে ঢাক বাজিয়ে চলছে, সঙ্গে পাড়ার ছোট একটি ছেলে কাঁসর বাজাচ্ছে। দরজায়, উঠোনে সমবেত ভক্তদের উৎসুক মুখ— এই বুঝি মা এসে ভর করবেন কালীদাসীর উপর। মালতী প্রায় ভেজানো দরজার একেবারে সামনে প্রণাম ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। জনার্দন উঠোনের এক ধারে অন্যান্য লোকদের সঙ্গে বসে আছে। আজ তার মন বড় উচাটন। মায়ের পূজায় তেমন মন বসছে না।

মালতী হঠাৎ উলু দিতেই সমবেত সব মহিলারাও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। সবাই দরজার সামনে ভীড় করতেই মালতী দরজা আগলে বলল — হুড়োহুড়ি নয়, একে একে এসে মায়ের দর্শন কর।

সাধন ময়রার বউ তার হারিয়ে যাওয়া ছেলের হদিস জানতে চাইলে ভরে উঠা কালীদাসী ঘোরের মধ্যে বলল— পশ্চিমে গেছে তোর ছেলে। বেচে আছে তবে এমনিতে আর ফিরবে না। জোড়া পাঁঠা বলি দিবি আর একজোড়া শাঁখা। তোর ছেলের অঙ্গহানির যোগ রয়েছে।

নিমাই বিশ্বাস, শিবু দাসের বউ, ছিদাম করাতী সবাই একে একে এসে মায়ের বাক্য নিয়ে গেল। কালীদাসী আচ্ছন্ন মাতালের মত সবার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে— বোম কালী, জয় মা কালী বলে চিৎকার করে উঠছে। হঠাৎ সমবেত ভীড় ঠেলে জনার্দন কালীদাসীর সামনে এসে দাঁড়াল। জীবনে এই প্রথম ভর উঠা কালীদাসীর মুখোমুখি দাঁড়াল জনার্দন। নিজের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জমেছে তার। কালীদাসী ঘোরের মধ্যেই বলল— তোর সংসার তো ছারখার হতে বসেছে। তোর তো কপালেও শান্তি নেই। এখনও সময় আছে, সরে যা। পালা।

— কোথায় পালাব? বলে জনার্দন কালীদাসীর পায়ের কাছেই বসে পড়ছিল। কালীদাসী চিৎকার দিয়ে বলল— আমাকে ছুঁবিনা একদম। পাপ। পাপী করিসনা আর আমাকে।

জনার্দন বজ্রাহতের মত সরে আসে। একঘর লোকের সামনে লজ্জায় অপমানে হতভম্ব জনার্দন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের মনে পরখ করে—পাপ! কোন্ পাপের কথা বলতে চাইছে কালিদাসী! তার ছাপোষা খেটে খাওয়া জীবনে জ্ঞানতঃ সে তেমন কোনো পাপ কি করেছে? মনে পড়েনা তার। তবে কী মালতীর প্রতি তার গোপন দুর্বলতাই তার পাপ? কিন্তু কালীদাসী যে বলল সব ছারখার হয়ে যাবে, সরে যেতে—এসবের মানে কি! তবে সংসার তো তার সত্যিই আর তেমন করে নেই।

রাত গভীর হয়। ভক্তরা একে একে সবাই বিদায় নিয়েছে। মা কালীর মূর্তির সামনে প্রদীপের মৃয়মান শিখা জ্বলছে। সারা ঘরে ছড়ানো ছিটানো ফুল, বেলপাতা। আবছা অন্ধকারে কালীদাসী বসে আছে স্থবির। আকাশের তারারাও ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। দিনের আলো ফুটতে আর খুব বেশি দেরী নেই। উথালপাথাল ফাল্গুনী হাওয়া বইছে চরাচরজুড়ে। জনার্দন ধীরে ধীরে উঠে এসে কালীদাসীর মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। আধো অন্ধকারে মুখ তুলে তাকায় কালীদাসী। অন্ধকারেও ঠাহর করে জনার্দন, ওর চোখ দুটো এখনও লাল, মুখ চোখ ফোলা। কয়েক মিনিট জনার্দনের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দু'হাত চোখমুখ আড়াল করে ডুকরে কেঁদে উঠে কালিদাসী— তুমি আমাকে ক্ষমা কর নিধুর বাপ। তুমি আমাকে ত্যাগ দাও।

— এ আবার কেমন কথা! জনার্দন স্ত্রীর মুখোমুখি বসে বলে।

— সত্যিই বলছি। আমিতো মায়ের পায়ে নিজের শান্তি খুঁজে পেয়েছি কিন্তু তোমাকে তো শান্তি দিতে পারিনি। কিচ্ছু দিতে পারিনি তোমাকে আমি। তুমি আমাকে ত্যাগ দিয়ে নতুন জীবন শুরু কর। এখনও সময় আছে।

— তোমার আমার সম্পর্ক কি শুধু দেয়া নেয়ার! মনের বন্ধন নেই? কুড়িটা বছর দু'জনে কত দুঃখ-কষ্ট একসাথে সহ্য করে এসেছি। আর আজ তুমি এমনতর কথা বললে হরিদাসী!

— আমার নিজেরও তো একটা বিচার বিবেচনা আছে বলো। আমি যে নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনা। দিনরাত মায়ের কাছে বলি— আমাকে তুলে নাও, নয় পাগল করে দাও মা! এই যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয়না

— আমরা আবার নতুন করে সব শুরু করতে পারিনা হরিদাসী? তোমাকে ছাড়া এই জীবন কাটানো আমার পক্ষে যে অসম্ভব। দিনদিন এভাবে কেন নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছ? ফিরে এসো হরিদাসী।

মুখ তুলে জনার্দনের চোখে চোখ রাখে হরিদাসী।

ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পাখিদের কলকাকলি আর নতুন ফুলের সুবাস নিয়ে শুরু হয়েছে একটা নতুন সকাল। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় মা কালীর হাসিমুখটি আরও জীবন্ত আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন।

মডার্ণ ক্লাবের
পক্ষ থেকে
সকল রাজ্যবাসীকে জানাই
শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

গল্প

বিশ্বাসের ঘরে চুরি

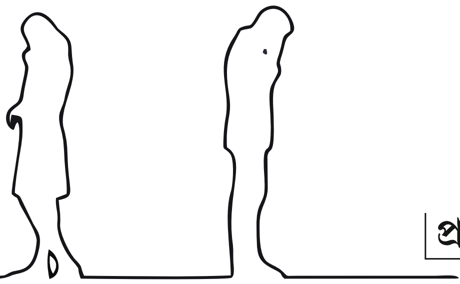

প্রনব সেনগুপ্ত

কাকিমার ঘরে বসে অঝোরে কাঁদছিল দৈবায়ন। সামনে রাখা খাবার। দৈবায়ন মুখেও তুলেনি। কাকিমা দেবরূপা ছেলের মতো দৈবায়নকে স্নেহ করেন। আজ তার কি হয়েছে বুঝে উঠতে পারছেন না তিনিও।

দৈবায়নকে আগে কখনও এমন ভেঙে পড়তে দেখেননি দেবরূপা। কি হয়েছে জানতে চান। দৈবায়ন ও তার ছোট বোন ঐন্দ্রিলাকে ছোট থেকেই খুব আদর করে আসছেন কাকিমা। আজ দৈবায়নকে রুগ্ন, ভারাক্রান্ত দেখে দেবরূপার ভাল লাগছে না।

স্ত্রী দেবস্মিতার সাথে দৈবায়নের কিছু হয়েছে কিনা আন্দাজ করার চেষ্টা করে দেবরূপা। এ নিয়ে প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি দৈবায়ন। পাগলের মতো দৈবায়ন ভালবাসে বৌকে। দেবস্মিতাকে নিয়ে কিছুদিন আগেও দক্ষিণ ভারত ঘুরে এসেছে দৈবায়ন। কাকিমাও দেবস্মিতাকে খুব ভালবাসেন। খুব মিষ্টি মুখের মেয়ে দেবস্মিতা।

কাকিমা দৈবায়নকে কান্না থামিয়ে মন খুলে কথা বলার জন্য বলেন। ফুপিয়ে কেঁদে উঠে দৈবায়ন। ঝরঝর করে দু'চোখ গড়িয়ে জল পড়তে থাকে তার। অনেক কষ্টে মুখ ফুটে দৈবায়ন বলে কাকিমা আমার বিশ্বাসের ঘরে চুরি হয়ে গেছে। দেবস্মিতার অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সে আমাকে মোটেই ভালবাসে না। এত বছর আমি মনে হয় ঘুমেই ছিলাম। সে রাতবিরেতে ফোনে, ফেসবুকে ব্যস্ত থাকে। কথা শুনে দেবরূপা বিরাট ধাক্কা খায়। এত বছর যাবৎ দেবস্মিতাকে হাসিখুশী ও ভাল মেয়ে হিসেবেই জানত কাকিমা। খানিক চুপ করে থেকে দৈবায়নকে সামলে নিতে বলে দেবরূপা। কাকিমা জিজ্ঞেস করে—তোর কোন ভুল হচ্ছে না তো? ছোট বোন ঐন্দ্রিলাও এসে উপস্থিত। দাদার কান্না দেখে নিজেও ভেঙ্গে পড়ে। দেবরূপা ও ঐন্দ্রিলা দৈবায়নকে জিজ্ঞেস করে, তুই ঠিক জানিস তো? না কোথাও কোন ভুল হচ্ছে? না কাকিমা আমি আর পারছি না, দেবস্মিতা আমার ভালবাসার বিন্দুমাত্র মর্যাদা দেয়নি। অনেকে ওদের ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। ফেসবুকে সম্পর্কটা এখন আমার বন্ধুরা সবাই জানে। এমনকি শুনেছি ওদের মধ্যে ফিজিক্যাল রিলেশনও আছে। বলতে বলতে দৈবায়ন আবার কেঁদে ফেলল। এ যেন আশাভঙ্গের কান্না, নিরাশার কান্না। কাকিমা পুত্রস্নেহে দৈবায়নকে অনেক বোঝান। সবদিকে যখন আঁধার ঘনিয়ে আসে তখনই দৈবায়ন কাকিমাকে মুখ খুলে সব বলে। শান্তি ও সমস্যা হালের আশায়। কাকিমা ও ঐন্দ্রিলা মিলে দৈবায়নকে সান্ত্বনা দেয়। তারা দু'জন সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাকিমা ও ঐন্দ্রিলা দৈবায়নের পাশে দাঁড়ায়। সাথে সংসার বাঁচাতে দেবস্মিতাকেও বোঝানোর চেষ্টা চলে। এখন যে ভাবেই হোক দৈবায়নকে শান্ত হতে হবে। সামনে চলার পথ সুন্দরভাবে নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। দৈবায়নের জন্য বড় কষ্ট হয় কাকিমার। বউ পাগলা ছেলে। কিছু একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে বসে। দৈবায়ন বলে— আমার ভালবাসায় কর্তব্যে কোনদিন এতটুকুও ফাঁক ছিল না। তবে কেন? ঐন্দ্রিলা বলে দাদা সত্যিই বৌদির প্রতি ছিল অনুরক্ত। সবসময় বৌদি বলতেই ছিল ধ্যানজ্ঞান। বৌদি যা বলতো অক্ষরে অক্ষরে দাদা যেন তাই শুনতো। আজ দাদা কেন, আমিও স্বপ্নে ভাবতে পারছি না বৌদি এমনটা করতে পারে।

দৈবায়নকে শান্ত করার জন্য ঐন্দ্রিলা ও কাকিমা পাশে বসে বলে— চুপ কর কাঁদিস না। আর দৈবায়ন বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদছে, তার কান্না থামছে না। তার মনের মধ্যে জমে থাকা বিষাদের পাহাড় মনে হয় চোখের জলে বরফের মতো গলছে। কাকিমা বলে কাঁদিস না দৈবায়ন, বললাম তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কাঁদলে সব সমস্যার সমাধান হয় না। যা, মুখ-চোখ ধুঁয়েনে। কিছুক্ষণ বাদে দৈবায়নকে খানিকটা রিলাক্স লাগছিল। দেখে মনে হচ্ছিল বোন ও কাকিমাকে বলে দৈবায়ন যেন খানিকটা হালকা হয়েছে। তার বুকের মাঝ থেকে পাথরটা নেমে গেছে। এবার সমাধান করার দায়িত্ব দেবরূপা আর ঐন্দ্রিলার । যদিও ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি হচ্ছিল কাকিমা ও ঐন্দ্রিলার।

কাকিমা ও বোনের প্রচেষ্টায় যদি সত্যিই দেবস্মিতা পরিবর্তন করে নিজেকে। তাহলে সব আগের মতো ঠিক হবার সুযোগ আছে। নয়তো ছারখার হয়ে যাবে সাজানো সংসার। ছেলের ভবিষ্যৎও ডুবে যাবে। দৈবায়ন বলতে থাকে দেবস্মিতা আমার বিশ্বাসের ঘরে চুরি করেছে। আজ আমি বিপর্যস্ত অসহায়।

অর্পিতা দেব, দ্বিতীয় বর্ষ, ইকফাই ইউনিভার্সিটি

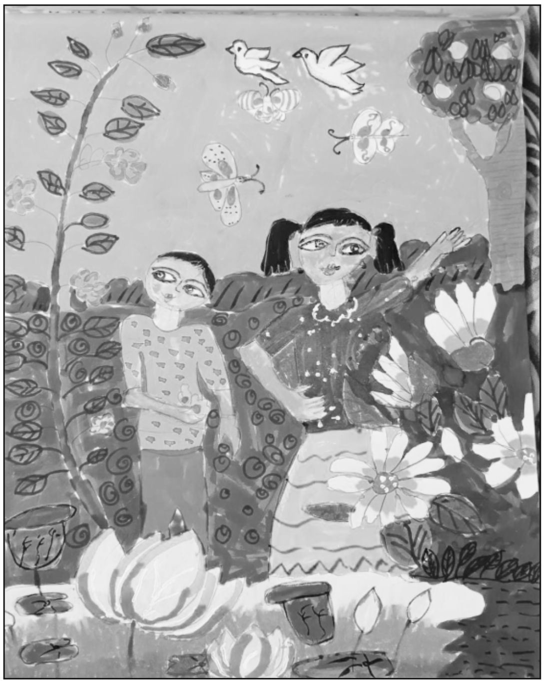

অলয় শংকর চক্রবর্তী, দ্বিতীয় শ্রেণী

হৃত্তিক রাজ পোদ্দার, কেজি-২

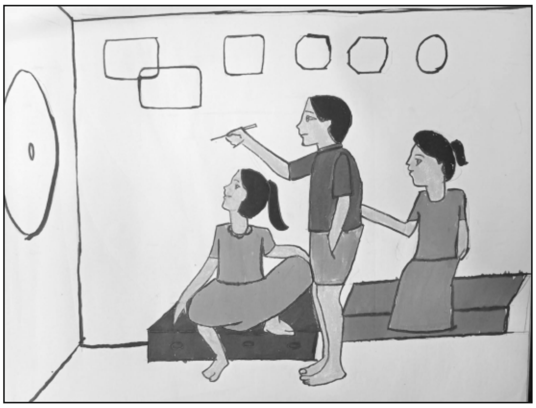

সৃনিকা দেব রায়, অষ্টম শ্রেণী

অগ্রতা দেব, সপ্তম শ্রেণী

দেবারতি রায়, নার্সারী-২

খেলা

নেতৃত্ব নিয়ে সংকটে ভারতীয় ক্রিকেট

সরযূ চক্রবর্তী

১৯৮৩'র ঐতিহাসিক ক্রিকেটে বিশ্ব জয়ের কাহিনী আজও পুলকিত করে গোটা দেশকে। তার আগের গল্পটা ছিল বড়ই বিভৎস। ভারতীয় ক্রিকেট দলে ক্রিকেটার কম নেতা ছিল বেশী। সকলকে এক পাশে রেখে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া ইংল্যান্ডে দল পাঠানোর আগে। কপিল দেব নিখাঞ্জ পেয়েছিলেন নেতৃত্বের ভার। কিন্তু সেই ভারটা হাল্কা করে সামনে দাঁড়িয়ে দেশকে প্রুডেনশিয়্যাল কাপ এনে দিয়েছিলেন।

সেই সোনালি ইতিহাস খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আবার এক দশকের বেশী সময় ধরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে চলে ডামাডোল। বিভিন্ন লবির আস্ফালনে ক্রিকেট মাঠ থেকে বেশী চলে টেবিলে। নেতার ছড়াছড়ি তখন গোটা দলে। এই অবস্থায় ফের ডামাডোল থেকে দলকে বাঁচাতে নাম উঠে আসে মহম্মদ আজহারউদ্দীনের। বোর্ডের সে সময়কার কর্তাদের এই সিদ্ধান্তের পর শুধু লবি দিয়ে খেলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নেতার ভারে ঝুঁকে থাকা দলে চলে সাফাই অভিযান। কিন্তু ম্যাচ ফিক্সিং-এর কড়াল থাবা আজহারের ক্যারিয়ারে ইতি টানে।

নেতৃত্বের সংকটে ফের ভুগতে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেট। কিংবদন্তী ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকরের হাতে দায়িত্ব দেয়া হলেও কঠিন কাজ সামাধানের রাস্তা খুঁজে পায়নি। কারণ শচীন বিশ্ববরেণ্য ক্রিকেটার রেকর্ড ভাঙার কারিগর হলেও অধিনায়ক হিসেবে ছিলেন নেতিবাচক। তাই অধিনায়কের স্বল্প সময়ের ক্যারিয়ারের ইতি শচীন নিজেই টেনে দেন।

সত্যিকার অর্থে ভারতীয় ক্রিকেটকে পেশাদার মনোভাব নিয়ে নেতৃত্ব দেয়ার কাজটা শুরু করেন সৌরভ গাঙ্গুলী। দাদার হাতে দায়িত্ব আসার পর প্রথমবারের মতো ইন্ডিয়ান ক্রিকেট রূপ নেয় "টিম ইন্ডিয়া" হিসেবে। দাদাই প্রথম গোটা দলকে একসূত্রে বাঁধার কাজ শুরু করেন। এর সুফলও আসতে শুরু করে। "টিম ইন্ডিয়া" থেকে "ম্যান ইন ব্লু"। নেট ওয়েস্ট ট্রফিতে ঐতিহাসিক লর্ডসে জার্সি খুলে বিতর্কের ঝড়। বিশ্বকাপে ফের ভারতকে ফাইন্যালে তোলা। বহু কীর্তি সে সময় রচিত হয়। কিন্তু ঈর্ষা এমনই একটা ক্যান্সার যা থেকে মুক্ত হতে সবাই পারে না। নিজের লোকেরাই মীরজাফরের ভূমিকায় ময়দানে নেমে পড়ে। দাদার সাজানো বাগান তছনছ হয়। চ্যাপেলকে দিয়ে এলোপাথাড়ি কাঁটাচেরা হয় ভারতীয় দলে। ফের সংকট তৈরী হয়।

কঠিন এই সময়ে উত্তরণের পথ খুঁজতে দায়িত্ব কাঁধে আসে বিহারীবাবু মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে। মাহি আসলে দাদার আবিষ্কার। দাদাই হাত ধরে টেনে ভারতীয় দলে ঢুকিয়েছিলেন মাহিকে। ফের বাজিমাৎ। মাহি শুরুটা করেন স্বপ্নের মতো। প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের খেতাব দলের কেমিস্ট্রিটা পাল্টে দেয়। আবর্জনা ছাঁটাই করে ফের ম্যান ইন ব্লু-রা ফিরতে শুরু করে স্বাভাবিক ছন্দে। নেতা মাহি অশ্বমেধ মাড়িয়ে চলে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে। বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ শীর্ষে উঠে আসে ভারত। একসময়ের অলিক স্বপ্ন পায় বাস্তবে রূপ। দীর্ঘ একটা সময় ভারত শুধুই ঈর্ষার কারণ ছিল।

মাহির এপিসোড শেষ হতেই এখন ফের নয়া সংকটে ভারত। নির্বাচকরা বিভ্রান্ত। কোন্ ফরম্যাটে কে হবেন নেতা, এরও দিশা নেই। আবারো একটা ট্রানজিট সময় চলছে নেতৃত্ব নিয়ে। চলছে বিস্তর নিরীক্ষা। কোনও আশার আলো এখনো পাওয়া যায়নি। রোহিত, লোকেশ থেকে ঋষভ। নেতৃত্ব নিয়ে রেনডম কাঁটাচেরা চলছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কপিল, দাদা বা মাহির উত্তরসূরি কে বেরিয়ে আসে সেদিকে তাকিয়ে ক্রিকেট প্রেমীরা।

ত্রিপুরার প্রজ্ঞাত
যোগাসনের প্রেরণা

বিপ্লব চন্দ

স্বপ্ন দেখা সহজ। কিন্তু সেই স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলা! বেশ কঠিন। তবে কঠিনকে অনেকটাই সহজ করে নিল মাত্র ১১ বছর বয়সের গ্র্যান্ডমাস্টার প্রজ্ঞাত প্রসূন। ওরফে 'ঋজু'।

৫১ পীঠের অরণ্যদ্রোহিতা সবুজ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিল যে প্রতিভা। বিস্ময় বালক প্রজ্ঞাত ত্রিপুরাকে নিয়ে গেল যোগাসনের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে। যার কারণে শুধু রাজ্যে নয়, দেশেও বিদেশের খবরের শিরোনামে ত্রিপুরার প্রজ্ঞাত প্রসূন।

কথিত আছে প্রায় ৫০০০ বছর আগের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন যোগাসন আজ আমাদের জীবনের মূল মহা ঔষধি। ২০১৪ সালে জাতিসংঘে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ জুন তারিখটিতে বিশ্ব যোগা দিবস পালনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ তার রেজিলিউশনের ৬৯/১৩১ ধারায় ২০১৫ সাল থেকে ২১ জুনকে বিশ্ব যোগা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

এরই আগেই ২০১১ সালের ২৪ মে জন্ম গ্রহণ করে প্রজ্ঞাত প্রসূন। জন্মের পর থেকে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে যোগাসনে মনোনিবেশ করে এই ছোট্ট ঋজু। মাত্র ৭ বছর বয়সে যোগাসনের অনুশীলন শুরু করে। বর্তমানে ১১ বছরের এই ঋজু পরিচিতি লাভ করেছে প্রজ্ঞাত প্রসুন নামে। এখন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ওএনজিসি আগরতলায় ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র প্রজ্ঞাত। এরই মধ্যে প্রজ্ঞাতের সাফল্যের ঝুড়িতে রয়েছে যোগাসনের ৫ টি বিশ্ব রেকর্ড, ১টি এশিয়ান রেকর্ড ও ২ টি জাতীয় রেকর্ড। দীর্ঘ সময় যোগাসন ধরে রাখার কৃতিত্ব অর্জনের জন্যই মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রজ্ঞাত প্রসূন 'গ্র্যান্ডমাস্টার' উপাধিতে ভূষিত হয়েছে।

প্রজ্ঞাত প্রসূনের সাফল্যের ৫ টি রেকর্ড হলো : ৩০ মিনিট ৫০ সেকেন্ড ভূনমাসন, ১৭ মিনিট ২৪ সেকেন্ড যৌগনিদ্রাসন, ১০ মিনিট ০১ সেকেন্ড বদ্ধ কোনাসন, ২৪ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড গর্ভ পিণ্ডাসন ও ১৫ মিনিট ৫০ সেকেন্ড কুরমাসন।

শুধু তাই নয়, এশিয়ার সবচেয়ে কম বয়সে কুরমাসন পোজ ধরে রাখার জন্য গিনিস ওয়ার্ল রেকর্ডেও নাম উঠে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১১ বছর বয়স হওয়ার কারণে আয়োজক কমিটি তা স্বীকৃতি দেয়নি। কারণ, গিনিস ওয়ার্ল রেকর্ডের প্রতিনিধিরা ১৬ বছর বয়সের কম হওয়ার কারণে প্রজ্ঞাত প্রসূনকে এই স্বীকৃতি দিতে পারেননি। আগামী পাঁচ বছর সুযোগ রয়েছে প্রজ্ঞাতের সামনে। তবে প্রজ্ঞাত প্রসূনের প্রধান লক্ষ্য গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা এবং অলিম্পিকে পদক জয় করা।

যদিও এরই মধ্যে ত্রিপুরার প্রথম যোগা প্রতিভা হিসেবে 'গ্র্যান্ডমাস্টার' শিরোপা অর্জন করে নিয়েছে প্রজ্ঞাত প্রসূন। ২০২১ সালের মার্চে কে ভি এস ওয়েবসাইটে সাফল্য অর্জন করে এই খুদে প্রতিভা। তাছাড়া ২০২২ সালে 'লিটল ওয়ান্ডার বয়' হিসেবে দিল্লিতে এন সি আর-এ অনুষ্ঠিত জুনিয়র বয়েজ যোগা ব্যায়ামে ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। যোগা বিশ্ব কাপ-২০২২ সালে চতুর্থ স্থান দখল করে প্রজ্ঞাত প্রসূন। যেখানে ভারতসহ অংশ নিয়েছিল ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা।

শুধু যোগাসনে বিশ্ব রেকর্ড নয়। মাত্র ১১ বছরের বিস্ময় বালক প্রজ্ঞাত প্রসূনের সাফল্য রয়েছে ইলেকট্রনিক বর্জ্য ও ভাঙা সামগ্রী দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল তৈরি করার। প্রজ্ঞাত প্রসূনের সাফল্যের পেছনে রয়েছেন বাবা প্রদীপ কুমার শীল ও মা তাপসী রায়ের কঠিন পরিশ্রম। প্রজ্ঞাত প্রসূনের সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, দ্রোণাচার্য গুরু বিশ্বেশ্বর নন্দীসহ রাজ্যের অগণিত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। বর্তমানে প্রজ্ঞাত প্রসূন তালিম নিচ্ছে এন এস আর সি সি'র যোগা কোচ শম্ভু চক্রবর্তীর কাছে। প্রত্যেকের আশা ও বিশ্বাস আগামীদিনে শুধু রাজ্যে নয়, গোটা বিশ্বে ত্রিপুরার নাম রোশন করবে প্রজ্ঞাত প্রসূন। আর প্রজ্ঞাত প্রসুন নিজেও বলতে পারবে— আই ওয়ান্ট টু মেক প্রাউড মাই ত্রিপুরা অ্যান্ড মাই ইন্ডিয়া।

মোদের ক্লাব

মডার্ণ ক্লাব পরিচালন কমিটি (২০২১-২০২৩)

পদ		নাম
সভাপতি	ঃ	সজল চক্রবর্তী
সহ সভাপতি	ঃ	সমর রায়
সহ সভাপতি	ঃ	স্বপন দত্ত (অপু)
সম্পাদক	ঃ	সঞ্জিত নাহা (লিটন)
সহ সম্পাদক	ঃ	দেবব্রত ভৌমিক (দেবু)
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	তপন রক্ষিত (যতন)
সহ কোষাধ্যক্ষ	ঃ	পার্শ্বনাথ ধর (ভোলা)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	আশীষ দেব
সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	জয়ন্ত কুমার ভদ্র (জয়)
ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ	প্রনব পোদ্দার
সহ ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ	দেবারুন দত্ত (বিটন)
অফিস সম্পাদক	ঃ	রবীন্দ্র সরকার (রবি)
প্রচার সম্পাদক	ঃ	উত্তম রায়
সহ প্রচার সম্পাদক	ঃ	মিন্টু দেব

সদস্য

সুবীর দত্ত, আশীষ রায়, রামকৃষ্ণ বণিক, বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, চন্দন কর, পার্থ চক্রবর্তী, বাপী দত্ত, অলক চক্রবর্তী, অলক দে, বিদ্যুৎ সেন, উত্তম ধর, তাপস ভদ্র ও পিনাক চক্রবর্তী।

উপদেষ্টা কমিটি

মিহির চক্রবর্তী
সঞ্জু দত্ত
মৃনালকান্তি দেবরায়
হিমাদ্রি সাহা
স্বরাজ দেব
মানিক রায় চৌধুরী
নয়ন কর চৌধুরী
সঞ্জয় চক্রবর্তী (শম্ভু)
শংকর দাশগুপ্ত
অমিয় রঞ্জন দাশ
দিলীপ বৈদ্য
ফণীন্দ্র চক্রবর্তী
সুনিল দাস
শান্তি সরকার
সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
অপু বিশ্বাস
জয়ন্ত পাল
অসীম বিশ্বাস
ভোলা চক্রবর্তী
গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী
সুব্রত ভৌমিক

মডার্ণ ক্লাব পূজা কমিটি - ২০২২

পদ	নাম
সভাপতি	ঃ বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
সহ সভাপতি	ঃ অপু বিশ্বাস, শিপ্রা রায় ও রিনা কপালি
সম্পাদক	ঃ পিনাক চক্রবর্তী
সহসম্পাদক	ঃ রানা সাহা, সন্ধ্যা পাল ও রুমা দে
কোষাধ্যক্ষ	ঃ চন্দন কর
সহকারী কোষাধ্যক্ষ	ঃ দেবারুন দত্ত

সদস্য/সদস্যা

অলক চক্রবর্তী, পার্থ সারথি দেব, তাপস ভদ্র, প্রনব পোদ্দার, মিন্টু দেব, মিতা চক্রবর্তী, রূপা রায় বৈদ্য, জয়ন্ত কুমার ভদ্র, দীপঙ্কর দেব, রীতা দেবরায়, সোমা সাহা, রূপা ধর, মালবিকা দেব, শিপ্রা দত্ত, বেলা দেব, শিল্পী ধর, দেবপ্রিয়া দত্ত, শুভঙ্কর দেব, সঞ্চয়িতা দত্ত ও নন্দা রক্ষিত

প্রতি ঘরে সুশাসন

TRIPURA STATEHOOD

ত্রিপুরা সরকার

आज़ादी का अमृत महोत्सव

অভিযানের ব্যাপ্তি : ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

এই অভিযানের রূপরেখা

* কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত ফ্ল্যাগশিপ স্কিম এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রতি ঘরে সিনিশ্চিত করা।
* প্রশাসন এবং সরকারি দপ্তরগুলির অংশগ্রহণে নগর এবং গ্রামীন এলাকায় উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়

* বিকাশ সভার মাধ্যমে ভিলেজ, পঞ্চায়েত, ব্লক, নগর, শহর এলাকায় কোন কোন প্রকল্প ও পরিষেবায় ঘাটতি রয়েছে তা চিহ্নিত করণ এবং বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
* ১১৭৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত / ভিলেজে, ৫৮টি ব্লকে, ৬টি নগর পঞ্চায়েত, ১৩টি পুরপরিষদ এবং আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সুবিধা প্রদানে আয়োজিত হবে শিবির।
* প্রতিটি জেলা সদরে ২ দিন ব্যাপী ''প্রতি ঘরে সুশাসন'' মেলা।
* সব শেষে মূল্যায়ন ও পুরস্কার প্রদান।

এই উন্নয়নে অংশীদার হয়ে আপনাদের পরামর্শ জানাতে ১৯০৬ নম্বর ডায়েল করুন।

সৌজন্যে ঃ ডুম্বুরনগর আর.ডি ব্লক।

With Best Compliments from..............

WHERE KIDS LOVE TO LEARN

KIDZEE

[Asia's Largest Pre-School]

Bhattapukur, Near Modern Club

Successfully running in Tripura last 18 years

Session : January to December

Plagroup- 2+, Nursery - 3+, Jr. KG-4+, Sr. KG-5+

For Admission or Details Contact

9774665165 / 943617480

A Franchisee of Zee Interactive Learning Systems Ltd.